

ଜୀବନ-ସଂଗ୍ରାହ

ଶ୍ରୀଯତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶଗୁପ୍ତ



ପରିଚ୍ଛେଦିତ ୨ୟ ସଂସ୍କରଣ

ଜୁଲାଇ, ୧୯୫୮ ।

* * * * *

প্রকাশক :—

শ্রীসরোজনাথ সরকার, এম্-এ, বি-এল্।

কমলা বুক ডিপো।

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট : শিখী শ্রীধীরেন বল।

মুদ্রাকর :—

শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস।

শ্রীপতি প্রেস।

১৪ নং ডি. এল্. রায় স্ট্রীট,

কলিকাতা—৬

বেঁধেছেন : হিন্দুস্থান বুক মেকান্স্।

* * * * *

দাম : আড়াই টাকা মাত্র।

উৎসর্গ

কল্যাণীয়া—

শ্রীমতী কল্পনা দেবীর করকমলে—

রাস-পূর্ণিমা

১৩৫৬

কলকাতা

}

লেখক—

জীবন-সংগ্রাম

এক

শেষ রাত্রির আবছা আলো-অন্ধকারের সমারোহ। করপোরেশনের উড়ে কুলিরা জলের পাইপ ঘাড়ে করে রাস্তায় এইমাত্র জল দিতে শুরু করেছে। ডিপো থেকে ট্রামগুলো রাস্তায় বেরিয়ে পড়বার জন্তু দম্ নিচ্ছে যেন যুখোযুখী দাঁড়িয়ে। ক'লকাতার দেশবন্ধু পার্কের নূতন বাড়ীগুলোর মুখ চেয়ে প্রভাতের প্রথম সূর্য্য উঠছে যেন একখানি প্রকাণ্ড সোনার খালা। তারপর তা থেকে আলোর জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে, তাই ছড়িয়ে পড়তে লাগলো সব ঘুমন্তদের বাড়ীর পূব জানালার পথ বেয়ে। সাইকেলে চড়ে খুবরের কাগজের হকার বাড়ীতে বাড়ীতে সব কাগজ বিলি করে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ-ঘুমন্ত সহর যেন জেগে উঠতে লাগলো প্রভাতের প্রথম ব্যস্ততার। ক্রমে ক্রমে ট্যান্ডি, রিক্সা, ট্রাম, বাস আর প্রাইভেট মোটরের কোলাহলমুখরতা যেন স্পষ্টতর হয়ে উঠলো।

ঘুম শেষের প্রভাতী শৈথিল্য নিয়ে বিলাস তখনো জেগে ঘুমুচ্ছে। তার মুখের ওপর এসে পড়েছে প্রভাত সূর্য্যের প্রথম আলো।

ঈদ-সংগ্রাম

মাধবী ইতিপূর্বেই শিশুপুত্রটিকে ঘুম থেকে তুলেছিল। এবার সে তাকে হাত মুখ ধুইয়ে প্যান্ট্‌ আর হাফসার্ট পরিয়ে পাঠিয়ে দিল, বিলাসকে ঘুম থেকে ডেকে তোলবার জন্য।

পাঁচ বছরের ছেলে অরুণ, বিলাসের গলাটি জড়িয়ে ধরে ব্যতিব্যস্ত ভাবে ডাকছিল,—“বাবা! বাবা গো! শীগগির উঠে পড় না! নইলে কিন্তু তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বাবা—বাবা!”

চোখ রগড়াতে রগড়াতে বিলাস ছেলের ডাকে, ঘুম থেকে জেগেই ছেলের গালে একটু চুমো খেয়ে উঠে পড়লো বিছানা থেকে।

চায়ের পাট শেষ করে বিলাস ছেলেকে নিয়ে চেয়ারে গিয়ে বোসলো। তারপর হুকুম করলো ‘চয়নিকা’ নিয়ে আসতে।

নাচতে নাচতে মহা আনন্দে অরুণ ‘চয়নিকা’ নিয়ে এসেই পড়তে শুরু কোরলো :—

“আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে—
প্রভাত পাখীর গান,
জানি না কেন রে এতদিন পরে
নাচিয়া উঠিল প্রাণ”

“ওটা তো তোমার মুখস্থ হয়ে গেছে বাবা! ওটা নয়।

জীবন-সংগ্রাম

সেইটে বল দেখি ?” বলেই বিলাস ছেলের মুখের দিকে চেয়ে
রইলো।

মুখ কাঁচমাচু করে অরুণ বোললে,—“আমার মুখস্থ
হয়নি সেটা বাবা। কি ক’রে তাহলে বোলবো আমি ?”

—“বেশ তবে আজকে ঐটেই মুখস্থ ক’র, আমি কাল
ভোরে শুনবো।”

—“তবে আমি এখন থেকে পড়তে শুরু করি ? কিন্তু সবটা
যদি বলতে না পারি কালকে—তবে তুমি বোকবে না বাবা ?

—“না—না বকবো কেন ?—তুমি পড় না, কাল না
বলতে পারো পরশু বলবে। কেমন এই কথা তো, তবে এবার
আমি নাইতে যাই তুমি পড় ?

অরুণ পড়তে শুরু কোরলো :—

“পারে না বহিতে নদী জলধার
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর
ডাকিছে দুদোয়েল পাহিছে কোয়েল
তোমার কানন সভাতে
মাঝখানে তুমি দাঁড়িয়ে জননী
শরৎ কালের প্রভাতে।”...

বিলাসের ছোট সংসার। দোতলার একটা ছোট ফ্ল্যাট।
আসবাবপত্রগুলো বেশ সাজানো গোছানো। বড় ঘর
খানিতে এক পাশে একখানা খাট তার ওপাশেই একটা
ছোট টেবিলের তিন দিকে খান কয়েক চেয়ার। একটু দূরে

জীবন-সংগ্রাম

জলচৌকির ওপরে একটা সেলায়ের কল, তার পাশেই একটা অরগ্যান হারমোনিয়ম। দেয়ালে সব ভালো ভালো প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। মাঝে মাঝে কোথাও বা রবীন্দ্রনাথের হাফবাষ্ট, কোথাও বা বিবেকানন্দের তেজোদীপ্ত ছবি। টেবিলের ওপরে একটা এলার্ম টাইমপিস্ 'ঘড়ি অকাতরে সময়ের তাগিদ দিয়ে যাচ্ছে। বেলা তখন সোয়া ন'টা।

বিলাসের আহালাদি ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে, অফিসে যাবার জঞ্জ জামা জুতো পরে সে তখন প্রস্তুত। মাধবী এসে পাশে দাঁড়ালো। অরুণ এসে দাঁড়ালো মায়ের আঁচল ধরে— বিলাসের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে। হাত ধরে পাশে টেনে নিয়ে বিলাস ছেলেকে চুমো খেয়ে সোহাগ কোরলো; তারপর মাধবীর দিকে চেয়ে একগাল হাসি হেসেই সে ঘর থেকে চটপট সিঁড়ি দিয়ে নেমে পথে বেরিয়ে পড়লো।

চাকরির তাগাদা যে একটা মানুষকে কেমন উদ্ধার মত ছুটিয়ে নিতে পারে, গাড়ীবারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছিল আর ভাবছিল মাধবী দেবী অনেকক্ষণ ধরে।

* * * * *

কর্মস্থল মাড়োয়ারীর গদিতে বিলাস যখন গিয়ে ঢুকলো তখন বেলা সোয়া দশটা। স্থানটী যে বিচিত্র তাতে সন্দেহ নেই।

জীবন-সংগ্রাম

প্রকাণ্ড হ'ল ঘরের ভেতরে ঢালা বিছানা। কক্ষের মেঝেতে সামনের প্রায় অর্ধেকটা, বড় একখান্না ফুল-পাতা-লতাবাহার রাবার ক্লথে মোড়া। গদীর সীমানা গিয়ে পৌঁচেছে প্রায় দেয়ালের গা পর্য্যন্ত। কর্মচারীদের প্রত্যেকের পাশেই একটি করে মেহগনি পালিশ কাঠের হাত বাস্তু ; কারো কারো পাশে ছোট এক একটা আয়রণ চেষ্ট ; আর সবাইকার সামনেই বসে লিখবার জন্ত একটা করে জলচৌকী। কর্মচারী বিশেষের পেছনে এক একটি উঁচু তাকিয়া।

পেছনের দেয়ালের প্রায় অর্ধেকটাই মার্বেল করা ফুল-পাতা-লতার দেয়ালছবি। আর ঠিক তার ওপরেই প্রায় তিন দিকের দেয়ালময় নানা রকমের দেবদেবীর ছবি। কোথাও রাজারাম, কোথাও কমলেকামিনী, কোথাও বা হনুমানের প্রণামরত রামসীতার বিরাট ছবি ;—আর তারই মাঝে মাঝে ফার্মের সত্বাধিকারীর বাপ-পিতামহের বড় বড় তৈল চিত্র। হল ঘরটির ঠিক মাঝখানের কড়িকাঠে একটা বিরাট বৈদ্যুতিক পাখা ঝাঁ ঝাঁ করে ঘুরছে। দেয়ালের ঠিক মাঝখানটিতে একটি বড় দেয়াল ঘড়ি। ঘড়ির তলার আসনটিতে বসেই বিলাস রোজ কাজ করে, আর তার পাশেই একটি তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে,—আলবোলায় তামাক সেবন করেন সেই ফার্মের সত্বাধিকারী। পরিধানে তার চোগা আর চাপ্‌কান, মাথায় একটা সোখীন নয়ানসুখ কাপড়ের জড়ানো পাগড়ী।

জীবন-সংগ্রাম

কিসের যে কারবার এখানে হয়, আর কিসের হয় না সে কথা বলা শক্ত। তবে লোক আসে প্রচুর! বাজালী, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, সিঙ্কিয়া তো আছেই,—তার ওপরে সাহেব সুবোও বাদ যায় না। মাল ডেলিভারী হচ্ছে কো'নটা পোর্ট কমিশনারের জেটী থেকে, কোনটা হচ্ছে—আলু পোস্টা থেকে, কোনটা হাওড়া ষ্টেশন অথবা শিয়ালদা থেকে। কিন্তু টাকা এসে জমা পড়ছে শুধু এই গদিতে। দশটাকা আর একশো টাকার—তাড়া তাড়া নোট।

এমনি কর্মব্যস্ততার শেষ হয়ে আসে প্রায় সন্ধ্যা হবার মুখে। দিনের কাজ শেষ করে বিলাস সবে গাত্রোথান করবে মনস্থ করছে, এমনি সময়ে মাড়োয়ারীবাবু বিলাসের কানের কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে বললেন—“চাউল কা কারবার মে তো বহুৎ গলৎআ-গিয়া বাবু সাব্! আদমী লোগোনকো এক এক করকে সব নোটিশ—দে দি-জিয়ে।” কর্তার কথা শুনে তো বিলাসের মুখ চুন আর কি! তবুও সে প্রশ্ন কোরলো, কেয়া গলদ আ-গিয়া বাবু সাব্?”

—“গলৎ কো বাত্ আপকো কেয়া সমঝায় গা? লেখা পড়ি আপতো সব কুছ্ জানতাই হায়। লোকসান-কো কারবার আউর হাম্ চালানে নেই মাংতা!”

কারবারের কথা জানা না জানায় বিলাসের কিছুই আসে যায় না। সে যেখানে চাকর, সেখানে চাকরীটাই তার বড়

জীবন-সংগ্রাম

কথা । তবুও সে একবার বোললো—“হবে হাম-লোক্কা কেয়া হাল্ হোগা বাবু সাব ?”

মাড়োয়ারীবাবু বিলাসের কথায় মুখব্যাদন করে বললেন,—
“আপ্‌কো কেয়া হর্জ্জা ?—কৈ আল্দা আফিস মে ফিন্ একঠো নকরি লে লি-জিয়ে । আপ্ এত্না লিখ্যা পড়ি কিয়া, কৈ একঠো অফিস্‌মে ফিন্ একঠো নকরি লেনে নেই শেকেগা ?”

সমস্যা গভীর ! এর পর যে আর নিজেকে ছোট করে লাভ কিছুই হবে না, সে কথা বিলাস মনে মনেই উপলব্ধি করলে । তারপর বোললে,—“তব্ বোলিয়ে, হাম্‌কো আভি কেয়া করনে হোগা ?” বিলাসের কথার জবাবে মাড়োয়ারীবাবু বললেন,—“আপ এক কাম কি-জিয়ে । কাল ফজিল্‌মে একদফে ইধার আ যাইয়ে । যো দশ আদমি আপসে তন্থা লেতা উন্ লোগোন্‌কো পন্দর পন্দর্ রোজ্‌কা তন্থা জেয়াদা দে কর্ নকরি খতম কর্ দি-জিয়ে ?” এ কথার পর গদিতে কালবিলম্ব করা বিলাসের পক্ষে আর মোটেই সম্ভব হয় নি ।

ছুই

নিম্ভক ছপুর । পাঁশের বিছানায় ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে
মাধবী তার শেলাইএর কলটা নিয়ে ঘরের মেঝেতে বসে স্বামীর
জন্তু একটা কতুয়া তৈরী করছিল । আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে
মনেই গুন্ গুনিয়ে গাইছিল ।

গান

তুমি কখন আসবে তাতো

নাহি জানি ।

তবু যে গো তারি লাগি,

রোজ নিরালে একলা আগি,

তোয়ার নামে অড়িয়ে মোরে

বাতাস করে কানাকানি ।

কোথার দূরে কোকিল ডাকে

কানন তলে,

প্রাণের কূলে মাতন লাগে ;—

পলে পলে ;

ছায়ার মত দিনের শেষে

কখন এসে উঠবে হেসে,

তারি লাগি একলা প্রিয়

গানের সুরে মিলাই বাণী ।

দোতালায় যে ঘরটিতে মাধবী বসে শেলাই ক'রছিল, সেই
ঘরের সামনের গাড়ী বারান্দার তলা দিয়ে, বাসনওয়ালী, কাটা

জীবন-সংগ্রাম

কাপড়, চিনে বাদাম বিক্রেতার স্বপ্নাত্ত মাতুলীওয়ালারা—সব হেঁকে যাচ্ছিল ব্যবসায়ের নানা জিনিষের রকমারী নাম ডাকতে ডাকতে। স্তব্ধ ছপুরের নিস্তব্ধতা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিল তাদের রকমারী সুরের কর্কশতায়।

সেলাইয়ের একটা ফোঁড় দাঁতে কাটতে কাটতে মাধবী কাপড়টাকে ঘুরিয়ে সেলাই করতে গিয়েই, ছ' হাত মেসিন চালিয়ে বুঝতে পারলো, ববিনের সূতো ফুরিয়েছে।

নূতন করে সূতো ভরে নিয়ে, সেটাকে আবার মেসিনে ভরে ঠিক করে নেবার সময়, ওপর তলা থেকে বাড়ীওয়ালার স্ত্রী মিনতী দেবী এসে মাধবীর কক্ষে প্রবেশ করলে। হাতে এক টুকরো কাটা কাপড়। কক্ষে প্রবেশ করেই বললে,—“দিদি যে বড় বস্তু দেখতে পাচ্ছি?”

কল চালাতে চালাতেই মাধবী উত্তর দিলে,—“কি আর করি বলুন না? আপনার মতো বড় মানুষ তো নই, কাঁহাতক আর রোডমেড্ জিনিষ কিনে সংসার চালাই?”

দেমাকের ভঙ্গীতে, চোখে ছুঁট হাসি হেসে, মিনতী বলে,—
বড়লোক, না ছাই? কোন যুগে দেখুন না কর্তা আমার বালীগঞ্জে প্লট কিনে রেখেছেন, তাতে বাড়ী কি আর উঠলো আজ অবধি? ওঁর নিজের হাত খরচা মাসে ছ'শো টাকা! তারপর ঐ যে মিনাটিকে দেখছেন?—ওটা হচ্ছেন ওর আর একটি খরচের ডিপো! বই, খাতা পোষাক আসাকের কথা না হয় বাদই দিলুম। ওই মেয়ের হাত খরচই হচ্ছে দিনে

জীবন-সংগ্রাম

পাঁচ টাকা! আর দেখুন তো আমার খরচ? দিনে পান দোকানার জন্ত মোটে আট গুণা পয়সা!”

যুচকি হেসে মাধবী উত্তর দেয়—“আপনার কর্তা তা’হলে বড় সোজা টাকা রোজগার করেন না? হাজার টাকার চাইতেও ঢের বেশী—কি বলুন?”

—“তা হলে কি হবে ভাই! এই তো দেখুন ওমাসে চাইলুম একটা বিছে হার; তা বললেন,—এখন সোনার ভরি নব্বই টাকা করে। এত দামের সোনা কি গয়না গড়ানো চলে? বলুন তো ভাই আপনি—নব্বই টাকাই হোক আর ন’শো টাকাই হোক থাকবে তো সব তোমারি? আমি ক’দিনই বা বাঁচবো? গতরটা যে রকম অনড় হয়েছে কখন কি হয় কে জানে! সামান্য একটা সখ বইতো নয়?”

মাধবী, এই অবস্থা মুখরা মেয়েমানুষটিকে রীতিমত ভয় করে! এর মূঢ়তা এবং অহঙ্কার এমনি অসহনীয় যে, তা আর বললে ফুরায় না। কাজেই তাকে পাশ কাটানোই সে সব চাইতে বেশী পছন্দ করে! ভয়ে-ভয়ে মাধবী বলে ওঠে—
“গলায় তো আপনার ভালো সোনার হার রয়েছে দেখছি? আর কি দরকার?” তারপরেই, সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে প্রশ্ন করে,—“ও কাপড় টুকু কেন এনেছেন বলুন না?”

মিনতী সহসা উত্তর দেন,—“শুধু কি হার এই একটা? এ রকম তো দশ পনেরোটা আমার হার রয়েছে! এই ধরন একটা মটর মালা,—একটা চন্দ্রহার—একটা মফ.চেন;—কে’ন

জীবন-সংগ্রাম

মিনা বুঝি আপনাকে বলেনি ?” তারপর একটু থেমে বলে—
“কিন্তু তা থাকলে কি হবে ভাই, নতুনের একটা সখ, সে হোল
অশ্রু কথা।” একটু দম নিয়ে তারপরে বললে—“এই কাপড়
টুকুর ছধারে ছটো সেলাই দিয়ে নেবার জগে আমি এসেছি
ভাই! মিনাকে অ’ত করে বল্লুম,—ছুঁড়ি কিছুতেই দিলে না
সেলাই করে। কেবলি ওর সময় নেই শুনতে শুনতে আমার
কান ঝলাপালা হয়ে গেল!”

যুচ্কি হেসে মাধবী বলে,—“কি হবে ওটা সেলাই করে ?”
ঠাট্টার ভঙ্গীতে চোক পাকিয়ে, মিনতী জবাব দেয়,—
“মাথার বালিসের ওয়াড় গো ঠাকুরগণ! তখনই বল্লুম মিনাকে,
দিসনে বাপু তুই সবগুলো বালিসের ওয়াড় ধোবাকে। সে-কি
শুনলে ছাই? ছটো বালিসের ছ’ডজন ওয়াড় ও ধরে তুলে
দিলে ধোপার হাতে! শুধু বালিশের ওপরে তোয়ালে ঢাকা
দিয়ে, আমার কেমন যেন বড্ড দিকসিক্ লাগে ভাই শুতে।
বাক্সে পড়েই ছিল এ কাপড়টা—তাতেই ভাবলুম নিয়ে যাই
দিদির কাছে, ছটো সেলাই দিয়ে আনি।” তারপর পান
চিবুতে চিবুতে পা ছড়িয়ে বসে বললে,—“কর্তার যত সব
কাণ্ড! শুধু শুধু কিনে আনলেন একটা সেলায়ের কল!
মিনা কচিং কখনো ব্লাউজ পেটিকোট এক আধটা সেলাই করে;
নইলে তো পড়ে পড়েই মেসিনটা মর্চে ধরবার উপক্রম
হোত। আমার ভাই আবার ও সব পোষায় না। বাপের
ঘরে ছিলুম, কোনদিন কুটোটি নেড়ে আমাদের খেতে হয় নি।

জীবন-সংগ্রাম

বাঁধা দরজী ছিল, বাঁধা সব জামা-কাপড়ের দোকান। মাসে মাসে বাবা তাদের সব মাইনে দিতেন। তা ছাড়া জিনিষের দাম তো সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দিতেন। ‘দরজী’—? মুখ থেকে বেরুবার অপেক্ষা রাখতো না—অমনি এসে দোর গোড়ায় হাজির। একটার যদি দরকার হোত তো অর্ডার দিয়ে—দ্বিতীয় দশ, বিশটার! ব্লাউজ, পেটাকোট, আর টাইট-ব্রেস্টের অভাব আমাদের ছিল না কোন কালে;—সেখানে বালিশের ওয়াড় আবার একটা জিনিষ? কি সংসারেই পড়েছি! সত্যিই মনে পড়লে হাসি পায়। আমায় কিনা উনি শেখাবেন সেলাইয়ের কাজ। আমার বয়ে গেছে মেশিন চালিয়ে সেলাই করতে।”

এমনি সময়ে রাস্তা থেকে হাঁক শোনা গেল—“বাসন নেবে গো?” মিনতী সমস্যাস্তে মাধবীর গাড়ী বারান্দার রেলিংয়ের উপর থেকে ঝুঁকে পড়ে বাসনওয়ালীকে ডেকে বললেন—“উপরে একবারটি এসো গো!”

উপরে এসে বাসনওয়ালী তার বেসাত নামিয়ে ভালো ভালো কাপ-ডিস্—প্লেট আর কাঁচের গ্লাসগুলো একটি একটি করে সাজাতে শুরু কোরলো।

মিনতী দেবী ততক্ষণে এক জোড়া কাপডিস আর একটা গ্লাস ছৌঁ মেরে তুলে নিয়েই তার দাম জিন্জেরস কোরলে,—কখানা ছেঁড়া গ্যাকড়া পেনে সে এগুলো দিয়ে যেতে পারে।

প্রশ্নের জবাবে, বাসনওয়ালী বললে,—“গ্যাকড়ায় কি আর

জীবন-সংগ্রাম

আজকাল বাসন কাপ-ডিস্ হয় মা ?—কাপড় দিতে হবে ?
অবিশি পুরনো কাপড়ই দেবেন মা ; মাঝে মধ্যে এক আধটুকু
ছেঁড়া থাকলেও চলবে ! কিন্তু পুরো কাপড়টা থাকা চাই ।
টুকরো আঁকড়া হলে তো চলবে না—মা !”

এক ছোড়া কাপ-ডিস্ আর একটা বাটা দেখিয়ে মাধবী
প্রশ্ন করে—“এর জন্য কি দিতে হবে বল দেখি ?”

হাত মুখ ঘুরিয়ে বাসনওয়ালী বলে—“চারখানা কাপড়
দিন মা আর কি বোলব ?” বাসনওয়ালীর কথায়, নিজের
গালে একটা চড় খেয়ে মিনতী হাতের বাসনগুলো মেঝেতে
নামিয়ে মাধবীর দিকে চেয়ে বোললে,—“শুনলেন দিদি
বাসনওয়ালীর কথা ? ঐ কটা জিনিষের জগে ওকে চার
চার খানা পুরনো কাপড় দিতে হবে । সে কাপড়ের আবার
রকমটা শুনলেন তো ?—কালে কালে এ সব হোল কি দিদি ?”

মাধবী অত্যন্ত নিস্পৃহ ভাবে মিনতীকে লক্ষ্য করে বললে,—
“থাক্গে, তবে আমার দরকার নেই দিদি ।”

মিনতী প্রায় চেষ্টা করে উঠে বাসনওয়ালীকে উদ্দেশ্য করে
বললে,—“কালে কালে তোমাদের সব হচ্ছে কি বলতে
পারো ? যে রকমের কাপড় তুমি চাইছ ও রকমের চারখানা
কাপড় দিলে কটা কাপ-ডিস্ আর কত' বাসন পাওয়া যায় তা
তুমি জানো ?”

মুখ নেড়ে হাত ঘুরিয়ে বাসনওয়ালী বলে—“খুব জানি
মা, খুব জানি । এই কাজ করে খাই আর আমরা জানিনে ?

জীবন-সংগ্রাম

চারখানা কাপড়ে আড়ন যা পাওয়া যেত, আজকাল তা মেলে না মা ছ'খানা কাপড়েও॥”

মিনতী খেঁকিয়ে উঠলো,—“হ্যাঁ তোমাকে বলেছে—মেলেনা বৈকি ? এই তো সেদিন এক বাসনওয়ালী এসেছিল, বললুম একখানা ছেঁড়া কাপড় পাবে, কি বাসন দেবে বলো ? সে হাতে তুলে দিয়ে গেল এক জোড়া কাপ-ডিস্, একখানা ভাল প্লেট, একটা দামী গেলাস—”

ছ'পা এগিয়ে এসে মিনতী দেবীর কাছে ছ'খানি হাত মেলে বাসনওয়ালী বললে,—“আমি হাত পেতে রয়েছি মা ? একবার যদি নিয়ে এসে সেগুলো আমাকে দেখাতে পারেন,—তা হলে মা, আমার এই সব বাসন আপনাকে অমনি দিয়ে যাবো—”

অপ্রস্তুত মিনতী সে কথার আর কোন উত্তর না দিয়ে, বাসনওয়ালীকে পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠবার পথে বলে চললো,—“অমনি দিয়ে যাবো ? কি আমার দানবীর এয়েছেন গো ?”

বাসনওয়ালীর কথার উচ্ছ্বাস তখন চরমে উঠেছে। মাধবীকেই উদ্দেশ্য করে সে তখন বলতে লাগলো,—“কি রকমের সব অণ্ডায় কথা মা শুনলেন তো ? ছেঁড়া কাপড়ের পরিমাণের বহরটাই উনি দেখালেন,—বাজারটার কথা আর একবারটিও ভাবলেন না ! ছ'টাকার কমে চুনো পুঁটী মাছ মেলে না। সাড়ে ষোল টাকা মণের র্যাশানের চাল,—তার না আছে জ্বাতের ঠিক, না আছে কিছু—, তার কোন্টা যে বালাম, বাঁকতুলসী, সিতেশাল, আর কোন্টা যে চামরমনি, তার কোন

জীবন-সংগ্রাম

ঠিক নেই ! অর্ধেক কাঁকর আর অর্ধেক তার পাথরে ভরতি এই ছম্বল্যের জিনিষ কিনে সাধ্য কি মা আমাদের পেট চালাই ?”

মাধবী দেবী আগাগোড়া ঘটনাটিকে মিটিয়ে দেবার জন্য বাসনওয়ালীকে বোললে—“হ্যাঁ তাতো সত্যিই ? যা বাজার পড়েছে সব জিনিষই মাগি, তার তোমরা করবে কি !” তারপর একটা হাই তুলে মাধবী বলে,—“উনি তো চলেই গেলেন, আর আমারও এ সব জিনিষের আজ তেমন দরকার নেই মা— তা ছাড়া তুমি যে ঞাকড়ার কথা বললে,—ও আবার খুঁজে আমাকে দেখতে হবে । তুমি বরং অল্প একদিন এসো !”

মাথায় বাসনের ঝড়ি তুলে, বাসনওয়ালী উত্তর দেয়—“সে কথা হচ্ছে না মা ! সে তোমার যেদিন সুবিধে হয় নিও ! বাজারের কথা হচ্ছিল কি না !—গরীব গরবা আমরাই তো সব বরছি না খেয়ে শুকিয়ে ! আইনের খাঁড়া দেখিতে যারা মানুষের যথাসর্বস্ব লুটে নিয়ে খাচ্ছে, তাদের তো কেউ কিছু আপনারা বোলছেন না ? দোষ করলুম বুঝি আমরা ? অভাব অভিযোগ তো আর আপনাদের গায়ে লাগে না মা ! তা অমনি করে আপনারা বোলবেন বই কি !” তারপর গজ্ গজ্ করতে করতে বাসনওয়ালী নীচে নেমে গেল ।

বাসনওয়ালী চলে যেতেই মিনতী দেবী আবার ওপর থেকে তড়বড়িয়ে নীচে নেমে এসেই মাধবীকে বলতে শুরু ক’রলে,— “আপনি শুনিয়ে দিতে পারলেন না ?—ওদের ধরে সব পুলিশে

জীবন-সংগ্রাম

দেওয়া উচিত! মাধবী দেবীর তরফ থেকে কোন উচ্চবাচ্য এলো না দেখে মিনতী দেবী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললে—“আজকাল এমনিই হয়েছে সব! সেদিন মিনাকে উনি একজোড়া জুতো কিনে দিলেন,—ওমা কি ছাই জুতো! তারই দাম নাকি হয়েছে সাড়ে আঠারো টাকা। শুনে আমার গা জ্বলতে লাগলো! সত্যিই এ হোল কি!”

দাঁতে মেলাই কাটতে কাটতে একটু হেসে, মাধবী দেবী উত্তরে বলে—“আপনার আর তাতে দুঃখ কি দিদি? কর্তার রোজগারে না কুলোয় আপনিও অফিসে গিয়ে কর্তার পাশে বসে পড়বেন। দুজনে মিলে টাকা রোজগার করে আনবেন! দুঃখ দুর্দশার সাধ্য কি যে আপনাদের জীবন যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটায়?”

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে মিনতী বলে,—“চাকরি করতে যাবো পুরুষ মানুষের গা ঘেঁসায়ঁসি করে অফিসে? তার চাইতে গলায় দড়ি দেওয়া ঢের ভালো!”

মিষ্টি হাসি হাসতে হাসতে মাধবী দেবী বললে,—আহা অণু পুরুষের গা ঘেঁসতে আপনাকে কে বোলছে! কর্তার গায়ে গা ঘেঁসে চাকরি করবেন তাতেও আপত্তি?”

এমনি সময়ে কলেজ ফির্তি মিনা এসে মাধবীর কক্ষে উকী মেরেই বলে উঠলো,—“একেবারে যেন জোড় মাগিক গো ছুটিতে। কিসের পরামর্শ হচ্ছে এত শুনি?”

মিনার কথায়, মাধবী হেসে উঠে বললে,—“যত ভাবনা তো

জীবন-সংগ্রাম

ভাই তোমাকে নিয়েই ! কলেজের মেয়েদের আজকাল আর কেন যেন ছেলেরা বিয়ে করতেই চায় না ! তাইতো ভেবে মরছি আমরা তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে !”

—“দয়া করে তোমরা আমার ভবিষ্যৎ না ভেবে বরং নিজের নিজের ভবিষ্যৎ ভাবো দেখি—।” বলেই মিনা গট গট করে উপরে চলে গেল ।

কাটা কাপড়ের টুকরোটুকু মেসিনের পাশে রেখে—মিনতীও মিনাকে ডাকতে ডাকতে ওপরে উঠে গেল ।

এরা সব চলে যেতেই মাধবীর হুঁস হোলো—ওমা বেলা যে পড়ে এসেছে ! এর পর সে,—মেসিন আর সেলাইএর সাজ-সরঞ্জাম তুলে রাখলো । ঘুম থেকে উঠে, ছেলে অরুণ ততক্ষণে দু’হাত দিয়ে চোখ রগড়াচ্ছিল ।

* * *

অফিস ফিরতি বিলাস যখন ঘরে এসে ঢুকলো তখন মাধবীর উনানে চায়ের জল ফুটছে । ছেল অরুণ টেবিলের কাছে বসে বই পড়ছে ।

মাধবী, বিলাসের উদাস গন্তীর মুখচ্ছবি দেখে চিন্তান্বিত হয়ে প্রশ্ন কোরল—“অমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন ? অসুখ বিসুখ কিছু হয়নি তো ? রাত্রিতে খাবে কি ? র্যাশানের আটা তো ফুয়িয়েছে । দুটি ভাতই রাঁধবো তো ? দেখি একবার গা-টা !” বিলাসের গায়ে হাত ঠেকিয়ে, দূরে

জীবন-সংগ্রাম

গিয়ে স'রে দাঁড়িয়ে মাধবী বললো,—“কি হয়েছে ব'ল দেখি ? গা তো দেখছি হিম ঠাণ্ডা !”

মনের অবস্থাটা ইতিপূর্বেই বিলাস সম্পূর্ণ গোপন করে ফেলেছিল। এতক্ষণ সে চিত্রাৰ্পিতের মত মাধবীর কাণ্ড কারখানা দেখে, মিটী মিটী হাসছিল ;—এবার বলে উঠলো “এরি মধ্যে পরীক্ষা শেষ ! এ রকম হোপলেস্ লেডি ডাক্তার আমার রোগ ধরতে পারবে না ! নাস' বরং ভালো—চাইকি এতক্ষণ মাথাটাই টিপতে শুরু করে দিত !”

সামনে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে মাধবী বললো,—“নাস'ই বলো আর ফাস'ই ব'লো রোগ যে কিছুই ধরতে পারিনি তা মনে কোরনা !—বলতে তোমাকে হবেই—মিছিমিছি খানিকক্ষণ চেপে থাকবে,—এই তো ?”—বলেই মাধবী হেঁসেলের দিকে রওনা হোল। বিলাস ততক্ষণে জামা কাপড় ছেড়ে লুঙ্গী পরে গুণ গুণ করে গাইতে শুরু করলো।

“গান গাওয়ারে আমার তুমি

কতই ছলে যে,

কতো সুখের খেলায় কতো

নয়ন জলে হে।

ধরা দিয়ে দাও না ধরা

এসো কাছে পালাও তরা

পরান করো ব্যথায় ভরা

পলে পলে হে।”.....

তিন

—“মেঝাডি বাড়ী আটিস্—ও মেঝাডি !” এই বলে ডাক্তে ডাক্তে গ্যাড়া উঠে এসে মিনতী দেবীর তেতলায় উপস্থিত হোল। অসময়ে ভাইয়ের এই আগমনে মনে মনে মিনতী দেবী তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। ভেতরের রাগ অনেকটা চেপে, কথার উত্তর দিতে গিয়ে ভাইকে সে বলে উঠলো,—“তোর কাণ্ডজ্ঞান কি দিন দিনই লোপ পাচ্ছে? কেন এমনি করে একদল ভাড়াটের মধ্যে আমাকে হাসাতে আসিস্ গুনি?”

দিদিব কথায় গ্যাড়া হ্য মেরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, শেষে বলে উঠলো,—“টবে টুই বলে ডে না—বলে ডে! একুনি টলে ডাচ্ছ! লোক পাটিয়েটিলি—টখন বুঝি মনে ঠিল না? এঁচে পল্লুম কি’না? টাই বুঝি টাড়িয়ে ডিটে টাস?”

লজ্জায়, অপমানে, মিনতীর কর্ণমূল পর্য্যন্ত ততক্ষণে লাল হয়ে উঠেছে। ধমকে সে তখন বলে উঠলো,—“বাইরে থেকে বাঁদবামো গুলো না করে, ঘরে এসে ঐ চেয়ারটায় বোস দিকি! ডেকেছি বলে কি তুই সদর রাস্তা থেকে অসভ্যের মত চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ী ঢুকবি?”

—“আগি আবার চেঁতালুম কোঠায়? টুইটো চেঁচাচ্ছিস! টোকে বড্ড ভালবাসি কিনা? টাই টুটে আসি। টাই টুডু-টুডু-টুই আমায় অপমান করিস!”—এই কথা বলেই আধভাঙ্গা গলায় গ্যাড়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু কোরল।

জীবন-সংগ্রাম

মিনতী দেখলো-বেগতিক। তখন সে নানাভাবে মিষ্টি কথায় ভাইকে শান্তনা দিয়ে নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়ে ভাইয়ের চোখ মোছাতে শুরু করলো।

ছাড়ার আনন্দ তখন আর ধরে না ; দাঁত মুখ ব্যাদান করে সে বললে—“টবে ড্যাক ডিকি—টুডু টুডু আমাকে বকছিলি যে ? নিজে টো কৈ ঠাকটে পাল্লনি ? এবার হিসেব করে ড্যাক্ ডিকি, টুই আমায় কটো ভালবাসিস ? সাথে আর আমি টোর ডগ্লে পাগল হই ! টুই আমায় ব’ল !—একবারটি বলে ড্যাক্ না ?—ডেহ মণ্ডার ঠেকে আমার প্রাণটা টোকে বিলিয়ে ডিটে পারি কি না ! এক্সুনি ডেকাবো ?—টুই ডেকুবি ? . . .”

এমনি সময়ে পাশের ঘরের গাড়ীবারান্দা থেকে অরগ্যান হারমোনিয়মে মিনার গান শোনা গেল।

গান

কেন,—পথ ভোলালে পথের মাঝখানে,—
আকুল গানে।

পাগলা হাওয়ার সুরে সুরে	সুরের মোহ কঠে তোমার
আবেশ যে তার বেড়ায় ঘুরে	সোহাগে মাথা
প্রেমের ব্যথায় ব্যাকুল হিষা	বিলায় কি গো ?—ষেথায় দূরে
হারায় অজানে।	চাঁদনী রাকা !—

চাওয়ার পথে পাইনি দেখা,
মন পেয়েছে তোমায় একা ;
এই অজানা মিলন মোদের—

কেহ না জানে।

জীবন-সংগ্রাম

মিনার গান শুনতে শুনতে ঞাডার মাথা একেবারে গুলিয়ে গেল! তখন কোথায় বা দিদি আর কেবা শোনে তার কথা।

বারে বারেই সে তখন জানালার পর্দা সরিয়ে যতবার মিনার গান শোনবার জন্য কান পাততে চায়, ততবার মিনতী দেবী তাকে তর্জনী দেখিয়ে কৃত্রিম ভৎসনার সুরে দাঁত কিডমিড় করতে থাকে!

মিনার গান শেষ হয়ে গেল। কিন্তু মিনতীর কৃত্রিম বিরক্তিতে ঞাডার মুখ তখন রাগে আর অভিমানে প্রায় বেলুনের আকার ধারণ করেছে!

মিনতী দেবী কলতলা থেকে হাতে মুখে জল দিয়ে কক্ষ প্রবেশ করলো। মিনা তার গান শেষ করে, সুরের শেষ রেশটুকু গুন্ গুন্ করে গাইতে গাইতে নীচে নামতে শুরু করলো।

সেই দিকে একবার জানালা দিয়ে উকী মেরে দেখে, ঞাড়া মিনতীর পা দুটো সহসা জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো,—

—“ডোঃই ডিডি, টুই শ্চুটু একটুখানি জামাইবাবুকে বলে দে; শ্চুটু একবারটী টোর ঠাকুরঝিকে আমি বিয়ে কোরবো! ঐ মেয়েটার জন্তে কতো রাড়ির যে আমি কেঁড়েছি, টোকে বললে ফুরোয় না!”

রাগত গস্তীর সুরে, চোখ পাকিয়ে, মিনতী দেবী ভাইকে শাসনের ভঙ্গিতে বলে উঠলো,—“ঞাখ্ ঞাড়া তোর বড্ড বেশী বার হয়েছে! লজ্জা করে না তোর এইসব কথা বোলতে?”

জীবন-সংগ্রাম

মিনাকে বিয়ে করবার কথা তুই ভাবতে পারিস কোন্ ছঃসাহসে? কি বিছেবুদ্ধি তোর? তাকে তুই খেতে দিবি কি? নিজে থাকবার নেই ঠাই—শঙ্করাকে ডাক!”

কিন্তু দিদির সে কথায় গ্যাড়া কান না দিয়ে, বণে উঠলে,—“টোর মটন এমন একটা গোমড়া টোমড়া ডি ড থাকতে আমার ঠাকুবার ডায়গার অভাবটা কি ঠুনি?” তারপর নিজের মাথার এলো চুল আর কণ্ঠনালী চুলকে—এক পাঁটা দাঁত বেব করে, গ্যাড়া হাসতে হাসতে বললো—“কি রকম গলা টুই একবার লক্ষ করেটিস? এ বাড়ীতে ঢুকলেই টোর ঠাকুবার ঐ গানটী কেন না গেয়ে ঠাকতে না পারে, বল দিকি? পড্‌গুলো টো টুই ঠুনবি না? টুডু টুডু আমার সঙ্গে ডাঁট্‌ কিড়মিড় করবি! কি রকম পড্‌গুলো—বল্‌ ডিকি?—

টাওয়ার পঠে পাইনি ডাকা,
মন পেয়েটে টোমায় একা,
এই অডানা মিলন মোণ্ডর
কেহ না ডানে?—

কটো গভীর প্রেম! টুই লক্ষ করেটিস? টোর পায়ে পড়ি ডিডি, টুই টুটু একটা বার ঐ মেয়েটার ঠাঙ্গ—আমার হাটে হাট মিলিয়ে ডিয়ে ড্যাক্—ওকে নিয়ে আমি কি রকম একটা ফিল্মের ঠবি টুলি? টুই টো জানিস্ না ডিডি, মেণ্টাল হাসপাতালের বিষ্টুডা আমায় কি বোলেটে ডানিস—?—বলেটে

জীবন-সংগ্রাম

মাত্র তিন মাস হাসপাতালে ট্রেনিং নিলেই লেডি ডাক্তার হয়ে উঠবে। সহর মাট্—হ'য় যাবে!” তারপর আধ ভাঙ্গা গলায়—ফিস্ ফিস্ করে, কথা বলার ভঙ্গিতে ঝাড়া মিনতীকে বোল্লে, —“একটীবার টুই শুটু ঐ মেয়েটাকে—মানে টোর ঠাকুরডিটাকে আমার সঙ্গে ভিড়িয়ে ডে না ডিডি?”

অন্যমনস্ক ভাবে মিনতী দেবী বোল্লে, —“তুই নিজে গিয়ে বোল্লেই তো পারিস্—! ও হোল কলেজ পড়া মেয়ে! আমার কথা শুনবে কে'ন? তোর জন্ম বুঝি আমি পরের মেয়ের হাতে চড় খেয়ে মরবো? নিজে গিয়ে একবার চড়টা খেয়ে আয় না!”

—ডুর্ টাই কি পারি? কি রকম ডেক্তে হোয়েচে ডেক্টিস্ না? যেন একটা টুলোর বালিশ! আচ্ছা ডিডি মেয়েটাকে ডামাইবাবু কোন ডোকানের টাল খাওয়ায় টুই বলটে পারিস্?”—

“—কেন—? তুই বুঝি নেইখান থেকে চাল কিনে খেয়ে মোটা হ'বি ভেবেছিস্? তা, অত পয়সা পারি কোথায়? ওর না হ'য় বড়লোক দাদা আছে!—তোর কে আছে শুনি?”

“—আমার বুঝি কেউ নেই টুই ভেবেছিস্”? আঙ্গুলে কর গুণে ঝাড়া তখন বোলতে লাগলো—“টুই আটিস্ বড়লোক ডিডি এক নম্বোর! ডাক্তার বিষ্টুডা—ডু-নম্বোর, আর টিন নম্বোর রয়েছে ডামাইবাবু—হিঃ হিঃ!”

জীবন-সংগ্রাম

“—তবে সেই জামাইবাবুকেই গিয়ে ধর না? আমার কাছে গজ্গজ্ করে মচ্ছিস কে’ন?”

“—আরে হাজার হোলেও টুই হট্টিস ডিডি! আচ্ছা টুই বোলতে পারিস, টোর টাকুরঝিটা কোন কলেজে পড়ে?—”

“—খুব পারি! তুই বুঝি ছারোয়ানের লাঠি খেতে সেই জায়গায় যাবি? তাই যাস্—সেটা ডায়োসিশন কলেজ!”

“—কি বল্‌লি—? ডারঠকর কলেজ? বিষ্টুডাকে বোললেই বুঝে নেবে। আচ্ছা ডারা এবার একটা এম্পার ওম্পার কোরবোই টুই ডেকে নিস্!—”

—“কিসের এম্পার-ওম্পার কোরবে হে? বিকেল বেলায় বাড়ী ঢুকে—পারা তো মাথায় করে নিয়েছ দেখছি?” বলতে বলতে ধীরেনবাবু ছাট্ কোট্ প্যাণ্ট পরিহিত অবস্থায়—অফিস ফির্তি বাড়ী এসে ঢুকলেন!

ধীরেন বাবুর গলার আওয়াজ পেয়েই ঞাড়া তিন লাফে, নীচের সিড়িতে নেমে গিয়ে চেষ্টিয়ে নীচ থেকে মিনতীকে ডেকে বল্‌লো—“আর এক ডিন্ আসবো ডিডি! বড্ড কাজ আছে রে আজ! আর একডিন আসবো!” তারপর ঞাড়া হন্ হন্ করে পথ চলতে লাগলো।

চার

রাত্রি তখন সবে মাত্র গোটা ন'য়েক হবে ; সম্মুখে উন্মুক্ত দেশবন্ধু পার্ক ! ধীরেনবাবু তার তেতলার গাড়ীবাড়ান্দায় ইঞ্জি-চেয়ারে বসে সবে মাত্র একটা সিগারেট ধরিয়েছেন, এমনি সময়ে মিনতী দেবী এসে তার পাশে দাঁড়ালো ।

স্ত্রীকে সম্মুখে দেখেই ধীরেনবাবু প্রশ্ন করলেন—“গাড়া আবার আজ এসেছিল কেন ?”

নিতান্ত নিস্পৃহ ভাবে মিনতি দেবী সে কথার উত্তরে বলে, —“অমনি” !

“—অমনি তো ও বড় একটা আসে না ! কারণ নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে !”

সে কথার উত্তর এড়িয়ে গিয়ে মিনতী বললো,— “বিলাসবাবু যে চাকরী গেছে, সে কথা তুমি শুনেছ ?”

“—না,—শুনিনি তো—? কেন তাই কি হয়েছে ?” বলেই ধীরেনবাবু স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন ।—“কিছুই যদি তাতে না হয়ে থাকে, তবে আর আমারই বা সে কথা বলে লাভ কি ?”

ধীরেনবাবু বললেন,—“হেঁয়ালী রেখে,—কি তোমার কথা— তাই বল না ?”

—“এর আবার হেঁয়ালী কি ? একটা ছা পোষা লোকের এ বাজারে চাকরী গেলে,—বাড়ীর ভাড়া সে দেবে কোথা

জীবন-সংগ্রাম

থেকে ?” বলেই মুখখানা কালো করে স্বামীর দিকে চেয়ে রইলো ।

ভাড়া সম্বন্ধে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এই উদ্বেগটা ধীরেনবাবুর ভালই লাগলো,—তাই তিনি কথার উত্তর না দিয়ে শুধু চিন্তা করতে লাগলেন ।

মিনতী দেবী বললো,—“নটিশ টটিশ নয়, তুমি কালকেই ওদের বাড়ী থেকে তুলে দিয়ে অন্য ভাড়াটে বসাও । ওরা লোকও তো! তেমন সুবিধের নয় ? অযথা সময় দিয়ে, খাতির দেখিয়ে—নিজেদের লোকসান কোরবে কে—এই ছুদ্দিনে ?”

এমনি সময়ে পাশের দরজা দিয়ে, মিনা এসে ধীরেনবাবুর বারান্দায় উপস্থিত হোল !

স্ত্রীকে এড়াবার জন্য ধীরেনবাবু বোনকে প্রশ্ন করে বোসলেন,—“তোমার লেডি টীচার আসেন নি ?”

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে—মিনা বলে—“বাঃ—রে ! তিনি তো আজ একমাস ধরে আসেন না,—তুমি তো তা জানোই !”

অকস্মাৎ অপ্রস্তুত হয়ে ধীরেনবাবু বললেন,—“ওঃ—হোঃ—তাইতো ! তুমি তো আমায় বলেইছিলে ? কিন্তু এখন পড়াগুলো কার কাছে বুঝে নিচ্ছ তাহলে । পরীক্ষা তো এসে পোড়ল বলে ? আর কাউকেই বা রাখছো না কেন ?—কোন লেডি প্রফেসর অথবা অন্য কাউকে ?”

“—বিনে মায়নায় যেখানে মাষ্টার পেয়ে গেলুম সেখানে অযথা খরচা করে আমার লাভ ?” মিনার কথায়, সহসা বাধা

জীবন-সংগ্রাম

দিয়ে, মিনতী দেবী বলে বসলো,—“—তুমি বুঝি নীচেকার ঐ বিলাসবাবুর স্ত্রীকেই মাষ্টারনি ঠিক করেছ? তাই বুঝি অতো বারে বারে ওঁর ঘরে তোমার যাতায়াত? আমি মনে করেছিলুম বুঝি তুমি আড্ডা দিতে যাও!”

রীতিমত আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে ধীরেনবাবু মিনাকে প্রশ্ন করলেন,—“বিলাসবাবুর স্ত্রী!—তিনি কতটুকু লেখাপড়া জানেন—তোমার বি, এ-ক্লাসের পড়া তিনি পড়াতে পারেন?”—

সুচতুরা—মিনা তখন দাদার দিকে গ্রীবাভঙ্গি করে বোলল,—“কেন পারবে না দাদা? উনি নিজেই তো এম, এ-পাশ।”

—“এম, এ, পাশ! তুমি বোলছো কি—মিনা?”

ধীরেনবাবুর অবাক হবার কাণ্ড দেখে মিনা অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলো,—“ওঁরা দুজনেই দস্তুর মতো শিক্ষিত! শুধু শিক্ষিত বললেই সবটুকু বলা হয় না দাদা—ওঁরা রীতিমত নিরহঙ্কার এবং বেশ উচু ঘরের সন্তান!”

সহসা খড়ে আগুন লেগে দপ্ করে জ্বলে ওঠার মত, মুখের কথা কেড়ে নিয়ে, মিনতী দেবী মিনাকে বললো, “তুমি কিছুই জানো না ঠাকুরঝি,—তোমার ঐ মাধবী বৌদিটা হচ্ছেন এক নম্বর চালিয়াৎ! লেখাপড়া ও মোটেই জানে না, সোয়ামীর কাছে শুনে শুনে কতগুলো ওপড় চালাকী—শিখেছে শুধু। তাতেই তুমি মনে করেছ বুঝি ও এম, এ পাশ?—পাগল আর কাকে বলে!—”

কথাগুলোর ভেতরে মিনতী দেবীর যে হিংসাটা প্রচ্ছন্ন ছিল

জীবন-সংগ্রাম

তার সমস্তটা জ্বালা যেন অতি অকস্মাৎ মিনাকে গ্রাস করে বোসলো,—মুখখানিকে রীতিমত গস্তীর করে তখন মীনা—বোললো,—“তুমি আমার গুরুজন হতে পারো কিন্তু তাই বলে—যে একটা উচ্চ শিক্ষিতা ভদ্রমহিলাকে অমনি করে দাদার কাছে ছোট করবে ?—সে আমি কিছতেই বরদাস্ত কোরবো না। শুধু নিজের শিক্ষাদিক্ষার মাপকাঠী দিয়েই জগতটাকে বিচার করবার চেষ্টা কোরো কেন বৌদি ?—আজকের যুগে কোনও উচ্চ শিক্ষিতা মহিলার নামে দাদার কাছে যা তা লাগানো—শুধু অপরাধ নয়,—দাদাকে শুদ্ধ তুমি অপমান কোরছ!” বলেই মিনা আর উত্তরের অপেক্ষা না করে, অত্যন্ত ব্যস্তভাবে নিজের কক্ষের দিকে যাত্রা কোরলো। রাগে আর অর্থহীন অপমানে মিনতী দেবীর অন্তর যেন তখন জ্বলে পুড়ে খার হয়ে যাচ্ছিল। আর ধীরেনবাবু ভাবছিলেন মিনার নতুন শিক্ষয়িত্রীর কথা।

কিছুক্ষণ বজ্রাহতের মত স্তব্ধ থেকে মিনতী মুখ ভার করে ধীরেনবাবুকে বোলল—“উচ্চ শিক্ষিতা বোন যে তোমার মুখের ওপরেই আমাকে অপমান করে গে’ল,—এতে কি তোমার মান বাড়লো ? না—কি ছ’ ভাই বোনে মিলে আমাকে তাড়াবার ফন্দি আট্‌ছো ?

স্ত্রীর এই অসংলগ্ন প্রশ্নের জবাব দেবার—উৎসাহ ততক্ষণে ধীরেনবাবুর সমূলে বিনষ্ট হয়েছে। তবুও অন্তমনস্কের মত একটা জবাব তিনি স্ত্রীকে না দিয়ে পারলেন না। বোললেন,—

জীবন-সংগ্রাম

“মিনা তো অপমান কিছু করে নি তোমাকে, বরং তুমিই তো তাকে আমার কাছে ছোট করলে—! ঝগড়া করবার ধৈর্য্য এবং উৎসাহ তোমার যথেষ্ট আছে জানি। অনুরোধ করলে একটা কথা শুনবে কি?”

“—থাক আর অনুরোধে কাজ নেই! তুমি শিক্ষিত, তোমার বোন শিক্ষিত—আর আমরা হলুম সব অশিক্ষিত অপদার্থ মানুষ! আমাদের কি আর মান সম্মান আছে?” তারপর অত্যন্ত রেগে গিয়ে মিনতী দেবী বোললো,—“বেশ বোনকে নিয়েই থেকে! যাচ্ছি আমি বাপের বাড়ীতে!”

স্ত্রীর শেষের কথায় ধীরেনবাবু অন্তরে রীতিমত বিরক্তি অনুভব করলেন—কিন্তু বাইরে তিনি সেটা যথা সম্ভব গোপন করে বললেন—“সেই ভাল, বাপের বাড়ীই তোমার উপযুক্ত স্থান! মা আজ বেঁচে থাকলে—তোমার মতন বউকে—” সহসা তাঁর গলার স্বর অস্বাভাবিক হয়ে উঠলো তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

“—আজ আমারও বাপের টাকা থাকলে, তোমাকে হাজত বাস করিয়ে, চিরজীবনের খেসারৎ—আদায় করে তবে ছাড়তুম!” বলতে বলতে মিনতী গাড়ী বারান্দা থেকে সরে পড়লো।

বোন এবং স্ত্রীর সঙ্গে এই মোখীক বাগ্বিতণ্ডায় হারিয়ে যাওয়া যৌবন জীবনের একখানি বেদনা মধুর স্মৃতি ধীরেনবাবুর হৃদয়ে অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। মনে পড়লো—স্কটীস্ চার্চ কলেজের বি-এ ক্লাসের কথা। মিসেস সুপ্রিয়া দাশের সঙ্গে ধীরেনবাবুর প্রথম পরিচয় হয় সেই কলেজেই। পড়া-

জীবন-সংগ্রাম

শুনোর ভেতর দিয়ে তাদের জীবনে যে যোগাযোগ সংঘটিত হয়েছিল,—তাকেই বাস্তবে পরিণত করবার জন্য উভয়ের পরিশ্রমের অন্ত ছিল না ! কিন্তু মিলনের পথে প্রথম বাধা দিয়ে বসলেন পিতা সৌরেন বাবু ! আর তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ছাত্র ধীরেনের স্নেহময়ী জননী—! তাঁরা ছিলেন বামুন ! আর সুপ্রিয়া ছিল কায়স্থ ! মাত্র এইটুকু—সামাজিক আপত্তির আছিলায় সৌরেন বাবু তার প্রিয়তম পুত্রকে রীতিমত বাধা দিলেন । ভীক, অসহায়, অনন্যোপায় ধীরেন তখন পিতামাতার পীড়াপিড়িতে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিনতীকে বিয়ে করেছিল—কিন্তু অন্তর থেকে মিনতীকে সে একটি দিনের জন্যও ভালবাসতে পারেনি !

...আর—সুপ্রিয়া ? আছে আজও সে জীবিতা আছে । লেডি ডাক্তারি সে পাশ করেছিল, কিন্তু তারপর সে যে কোথায় আছে সে খবর আর তাঁর জানা নেই ।

মাঝে মাঝে মনে হয় আজ যদি সুপ্রিয়াকে পাওয়া যেত ? কিন্তু তারপরই তাঁর মন উদাস হয়ে ওঠে । না—না—প্রেমহীন বন্ধনে কাউকেই অন্তরে আবদ্ধ করা যায় না । একটি নিশ্বাস মোচন করলেন ধীরেন বাবু । মিনাকে তিনি ছোটবেলা থেকে মানুষ করে আসছেন তাই তাকে তিনি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনদিনই লেখাপড়া ছাড়িয়ে, বিবাহের গণ্ডির মধ্যে এত শীগগির নিক্ষেপ করতে চান না ।

মিনতীর এই নিলজ্জ নিষ্ঠুর ভাষণে আজ অতিষ্ঠ হয়ে,

জীবন-সংগ্রাম

ধীরেন বাবু একবার ভাবলেন মিনার বর্তমান শিক্ষয়িত্রী মাধবী দেবীর কথা !

সুপ্রিয়াকে তিনি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন । আজ শুধু এই সুশিক্ষিতা মাধবী দেবীর কথায় বহুদিন পর একবার তাঁর সুপ্রিয়ার কথা মনে পড়তেই তিনি দেখবার চেষ্টা করছিলেন, মাধবী দেবীকে সুপ্রিয়ার সঙ্গে মিলিয়ে ।

অদূরের ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে রাত্রি দশটা বাজতে শুরু করেছিল । কাল বৈশাখীর কালো মেঘে সমস্ত আকাশ খানা তখন আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে, আর তার ফাঁকে ফাঁকে—মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে উঠছিল । ধীরেন বাবুর ঠাকুর এসে তাঁকে রাত্রির আহারের আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল । পাশের বাড়ীর ট্রান্সপোর্টেবল মেসিনে তখন কে যেন একখানা গান চাপিয়েছে ।—

“এমন দিনে তারে বলা যায়—
এমন ঘন ঘোর বরিষায় !”... ..

পাঁচ

সেদিন সন্ধ্যা হবার মুখে, ক্লাস্ত অবসন্ন দেহ নিয়ে বিলাস ঘরে ফিরেই প্রাণপণে গলার নেকটাইটা ধরে টানতে শুরু কোরল। যত সে তাড়াতাড়ি খুলতে চায় তত যেন নেকটাইয়ের বাঁধন তাকে ফাঁসি দিয়ে মারতে চায়। মাধবী এ ঘরে তখন কি একটা রান্নার বাসন নিতে এসেছিল। বিলাসের অবস্থা দেখে সহসা হেসে ফেলেই হাতের বাসনটা নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে বিলাসের নেকটাই-টা খুলে দিয়েই বললো,—“তুমি মাঝে মাঝে জামা কাপড় গুলো নিয়ে অমন ধবস্তাধবস্তি করো কেন? জানো—যে পয়সা হলেও অনেক কিছুই আজকাল এ বাজারে দুস্প্রাপ্য!—তোমার এই বদ অভ্যাস কবে ঘুচবে আমায় বলতে পারো?”

ততক্ষণে প্যান্ট-কোট গুলো আলনায় রেখে, লুঙ্গি পরতে পরতে বিলাস বলে,—“বড়লোকের মেয়ে ছিলে মোটরেই শুধু চড়েছ, সাইকেলে তো কোনদিন চড়নি! সাইকেলে চাপলে বুঝতে, চলবার বেলায় ওতে চড়ে ভারি আরাম! কিন্তু যেই নেমেছ আর র'ক্ষে নেই, এক যুহুর্টে ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠবে! গরমের দিনে তো কথাই নেই! শীতের দিনে আরো মজা, চলবার সময় হাত পা আর কান ছুটোতে, মনে হবে যেন কেউ বরফের বিছুটি মারছে। নাবলেই সর্ব্ব অঙ্গ রীতিমত সেনস্লেস্।”

জীবন-সংগ্রাম

“এই নেকটাইয়ের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করবার ব্যাপারে সাইকেলের কথা উঠছে কেন—?”

পাইচারী করতে করতে, বিলাস উত্তর দেয়,—
“সাইকেলের কথা এই জন্ম উঠছে যে,—আজকের দিনের কলকাতার ট্রাম, গরমের দিনের সাইকেলকেও হার মানিয়ে ছেড়েছে! উঠতে প্রাণান্তকর ধ্বস্তাধ্বস্তি, নামতে জামা ছিঁড়বে কি কাপড় ছিঁড়বে তার ঠিক নেই! আর তার ভেতরে যতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলে ভিড়ের চাপে শ্রেফ বাস বন্দী। এ হেন ট্রাম থেকে নেমে, এই বাসা পর্যন্ত আসতে, হাওয়া গায়ে লাগাবার জন্ম যে ভাবে—ছুটেতে হয়, তাতে ঘরে এসে ধেমে পড়া মানেই সাইকেল থেকে নামার অবস্থা দাঁড়ালো। তখন জামা কাপড় গুলোক মনে হয় মহাশত্রু! গা থেকে খোলার যেন আর কিছুতেই ঘর নয় না। তাতেই এই টান পোড়েন!”

“—উঃ—এই সামান্য একটা কথা বোলতে যদি এতো ভূমিকা দিতে হয়, তাহলে মানুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলে কি করে? সব সময়ে তোমার কথা মানুষে বুঝতে পারে? আমার কিন্তু হাসি পায়!” তারপর সে বললো,—“রান্না ঘর থেকে ঘুরে আসছি, ততক্ষণে তুমি হাত মুখটা ধুয়ে এসো।—”

বিলাস বাথরুম থেকে ফিরে এসে মাথার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে শুনলো—টেবিলে বসে তার ছেলে অরুণ পড়ছে,—

“বোলনা কার্ত্তির স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে,—

এ-জীবন নিশার স্বপন ;”

জীবন-সংগ্রাম

ঐ পর্য্যন্ত গুনেই বিলাস মাথার চিরুনি হাতে নিয়ে ছেলেকে বললো—“দাড়াও বাবা ওটা কিন্তু আজকের দিনের কবিতা নয়—এখন পড়তে হবে—”

বলিও কাতর স্বরে মিথ্যা জন্ম এ সংসারে,—

এ-জীবন বিভ্রান্ত স্বপন ;—

বিলাসের কাণ্ড দেখে এ ঘরে ঢুকই মাধবী বলে উঠলো,
“তুমি আরম্ভ করলে কি ? ছেলেটাকে পড়তেও দেবেনা দেখছি !”

“পড়তে দেব'না মানে ?—ছেলে-কি আমার সেকলে নাকি ?
ছুদিন পরে বড় হলেই তো ও বুঝবে, এ সংসারে জন্মানটাই
ওর'বুখা হয়েছে । দেখতে পাচ্ছনা কত টাকা মনের চাল !
কো'ন ভদ্র সহরে বাস করবার জন্ম বাড়ী মেলেনা,—এককাঁড়ি
পয়সা দিয়েও সময় মত খাওয়া সামগ্রী পাওয়া যায় না ! এই
যুগে বসে, 'বোলনা কাতর স্বরে'—ছেলেকে শেখালে, একদিন ও
পরিষ্কার বুঝবে, বাপ্ মা ওকে ভাল শিক্ষা দিয়েছে ।”

“—তা হাজার হলেও ওগুলো হিতোপদেশের মত কথা
তো ?—ছেলেকে কে আর অত বুঝিয়ে পড়াতে যায় ? যত সব
তোমার পাগলামী !” বলেই মাধবী হাসতে হাসতে শুরু করে
—“বেশ, তা হলে বলে দাও কি পড়বে তোমার ছেলে ?”
তারপর হেসেলের দিকে যেই পা বাড়াতে যায় মাধবী, অমনি
তার বাঁ হাতটা চেপে ধরে বিলাস বলে,—“দাড়াও !” আর
ছেলেকে হুকুম করে, “কাজী নজরুল ইসলামের অগ্নিবীণাটা
নিয়ে এসো তো বাবা ! তারপর পাঁচের পাতাটা খুলে সেই
'বিদ্রোহী' কবিতাটা পড়'তো !”

জীবন-সংগ্রাম

পিতৃ আশ্রয় অরুণ তাড়াতাড়ি বই-এর সেলপ্ থেকে
বইখানা নিয়ে এসেই পড়তে শুরু কোরল—

“—বল বীর—

বল উন্নত মম শির

শির নেহারি আমারি, নত শির ওই শির হিমাত্রি !

বল বীর—

বল—মহাবিশ্বের মহাকাশ ছাড়ি’

চল সূর্য্য গ্রহতারা ছাড়ি’

ভুলে ক দু লোক গোলক ছেদিয়া,

খে দার আসন ‘আবশ’ ভেদিয়া,

উষ্টিয়াছি চির বিশ্বয় আমি বিশ্ব-বিধাতীর !

মম ললাটে রুদ্র ভগবান স্নেহ—রাজ—রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর—!

বল বীর—

আমি চির উন্নত শির !”

প্রশংস দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে বিলাস বললো—
“চমৎকার ! তুমি পড়ে যাও—আমরা গাড়ী বারান্দায় দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে শুনছি।” বলেই—মাধবীকে নিয়ে পাশের দরজা
দিয়ে বিলাস ছোতলার গাড়ী বারান্দায় গিয়ে উপস্থিত হ’ল।
বাইরে থেকে অস্পষ্টভাবে তখনো শোনা যাচ্ছিল,—অরুণ
পড়ে চলেছে :—

“আমি চির হৃদয় হৃদিনীত, নৃশংস,

মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইকোন, আমি ধ্বংস,

আমি মহা-ভয়, আমি অভিশাপ পৃথিবী !”.....

বারান্দায় দাঁড়িয়ে মাধবী হাসে আর বলে,—“এ সব তোমার
পাগলামো নয় ? কি বুঝবে ঐ টুকু ছেলে ঐ কবিতার।

জীবন-সংগ্রাম

মুখস্ত করিয়েছ তাই—ও তো নেশার ঝাঁকেই পড়ে চলেছে।
ওর একটা লাইনেরো অর্থ বুঝবে না—ও ! মাঝখান থেকে
ছেলেটা বয়ে যাবে !”

মাথা চুল্কে বিলাস উত্তর দেয়, “বয়ে গেলেই হোল ?
কিন্তু—শীর্ণ, শাস্ত, সাধু ছেলেকে দিয়েও এ যুগে কাজ চলবে
না ! তাই বলে তোমার ঐ হিতোপদেশ আমি ছেলেকে
কিছুতেই শেখাতে রাজী নই ! সেকালে তিন টাকা মনের চাল
ছিল। মাছ, কাপড়, তরি তরকারীর তো কথাই ছিল না ;—
মোজ করে দিব্যি পেট ভরে চব্বা, চুষা, লেছ পেয় খেয়ে
কবি লিখলেন,—‘বোলো না কাতর স্বরে বৃথা ৬ম এ
সংসারে’,—সেই কথা আজকের যুগের ছেলেকে পড়িয়ে আমি
ছেলেটার পরকাল ঝরঝরে করে দোবো তুমি বলতে চাও ?”

মাধবী মনে মনে বুঝলো, এটা বিলাসের মস্তিষ্ক বিকৃতির
পূর্ব লক্ষণ। তাই ছেলের লেখাপড়া সম্বন্ধে স্বামীর সঙ্গে
আলোচনা নিরর্থক মনে করে সে অন্য কথা শুরু কোরলো !

—“আমি বলছিলুম—এই চাকরীর জন্ত অযথা ছুটোছুটি না
করে একটা কিছু ছোট খাটো ব্যবসায় লেগে গেলে হোত না ?”

“—হোত বই কি ! মূলধন দেবে কে ?”

“—কি ব্যবসা করবে আগে শুনি ?”

“—ব্যবসা ধর না কে’ন—এই চাল ডালের কারবার !
জমি বেচা কেনা, ষ্টেশনারী দোকান—ডাইং ক্লিনিং—রেষ্টুরেন্ট,
আর কতো বোলবো ?”

জীবন-সংগ্রাম

“—গোড়ার গুলো যা বললে সে তো অনেক টাকার ব্যাপার ! কিন্তু শেষের গুলোতে কি রকম মূলধন লাগবে শুনি ? আর—মাস গেলে লাভই বা থাকবে কতো ?”

“—ব্যবসাটা একবার ফেঁদে না বসতে পারলে লাভের কথা তোমায় আজকেই কি ক’রে বোলবো ? তবে ব্যবসা মানেই এযুগে টাকা ইন্ভেস্টমেন্টের ব্যাপার । সে তুমি আর হাজার দেড় হাজারের কমে কি আসা করতে পারো ?”

“—আমার এই সব গয়না বেচলে এখন কত টাকা হতে পারে—? প্রায় বিশ ভরি সোণা তো রয়েছে !”

তুই চক্ষু বিস্ফারিত করে, বিলাস বলে, “—ঘরের গয়না বেচে ব্যবসা ! রক্ষা করো ওতে আমার কাজ নেই ! শেষ-কালে যদি ব্যবসায় ফেল মেরে দি—তখন ?—অমন ব্যবসায় কাজ নেই । তার চাইতে বরং দালালি কোরবো !”

চিন্তাশ্রিত ভাবে মাধবী তখন জিজ্ঞাসা কোরলো—“আজ কোথায় কোথায় ঘুরলে ?”

“—দুরলুম মানে ?—দস্তুর মত চাকরীর উমেদারী করে এলুম ! শালকে তেল কল থেকে শুরু করে গিলেগারের জুট মিল—কোথাও বাদ নেই !”

“—তাতে হবার আশা হোল কিছু ?”

“—আশা ?—নিশ্চয় !—আশা আছে বই কি ! ছাটিফিকেটে একটা এম, এ ডিগ্রী রয়েছে ! মুখের ওপরে আর কি করে বলে, যে—আসবেন না মশাই ! তাতেই সহানুভূতি

জীবন-সংগ্রাম

দেখিয়ে বেশীরভাগ কোম্পানীর কর্মকর্তারাই বোললেন, ‘আসবেন মাঝে মাঝে দেখবো !’ অতএব আমিও মাঝে মাঝে নিত্য নূতন জায়গায় গিয়ে, একদিন ঘরে ফিরে নেকটাই ছিঁড়বো—আর একদিন ছিঁড়বো প্যান্টুলুন্ !” একটু থেমে শেষে বলে, “এই স্নেচ্ছ পোষাকটা আমি আর কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না ! লজ্জাও করে, গরমেও মরি ! তুমি বরং কাল থেকে আমার ধুতিপাজাবীর ব্যবস্থা দেখ ।”

ইতিপূর্বে মাধবী অন্তমনস্ক হয়ে পড়েছিল, বিলাসের কথা তার কানে ঢোকেনি । তাই সহসা সে চম্কে বলে উঠলো,— “ঐ-যাঃ—কখন সেই কেটলিতে জল চাপিয়ে এসেছি,— তোমারও চা খাবার তাড়া নেই, আমারও মনে নেই ! দাঁড়াও চা টা আগে নিয়ে আসি !”

মাধবী চলে গেলে,—বিলাস অনেকক্ষণ পার্কের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগলো—তার বর্তমান জীবন, আর ফেলে আসা দিনগুলির কথা ! কতই না মধুময়ী—জীবনের সূত্রপাত করেছিল তারা ! মাধবী তখন তার সহপাঠী ! ছুজনেই এম-এ ক্লাসে পড়ে ! বিলাসের কাছে, যে মাধবী ছিল একদিন আকাশ কুমুম কল্পনার বস্তু—সেই মাধবী তাকে বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতি দিলো ! মাধবীর ব্যারিষ্টার পিতা—সে জগু তাকে কত শাসালেন—কত গাল মন্দ করলেন,—একমাত্র কথা হলেও তিনি তাকে বিপদে সাহায্য করবেন না বলে ভয় পর্যন্ত দেখালেন । মাধবী কিছুই গ্রাহ্য করে নি । তারপর সত্যিই যেদিন মাধবী

জীবন-সংগ্রাম

তার স্মটকেশটা নিয়ে এসে বিলাসের বোর্ডিং-এ উঠলো,— সেদিনের কথা বিলাস জীবনেও ভুলতে পারবে না। তারপর মনে পড়ে মাধবীকে নিয়ে সংসার পাতানোর কথা। ঘর আলো করে প্রথম সন্তান যেদিন তাদের কোলে এলো একটা ফুটফুটে মেয়ে, সে যে কি একটা দিন গেছে তার কল্পনায়ও সুখ ছিল। ভগবান তাদের সে আনন্দে এনে দিলেন আপশোষ—সেই শিশু কণ্ঠটিকে অকালে হরণ করে। তারপর এসেছে এই অরুণ! বেকার সমস্যা দেশে যখন প্রবল হয়ে উঠলো তখনই বিলাসের চাকরীটাও গেল চলে! এই ছম্বল্যের বাজারে এখন সে সংসার চালাবে কি করে? এ বাজারে চাকরী একটা ছঃস্বপ্ন! দিনের পর দিন কাজ কারবার সব গোল্লায় যাচ্ছে; একটার পর একটা কোম্পানী রোজ ফেল মারছে! ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলোর অবস্থা চরমে উঠেছে! চতুর্দিকে শুধু ঘনায়মান দুর্যোগ আর দুর্দশার প্রতিচ্ছবি, বিলাস আর ভাবতে পারে না! অনন্ত অকূল এই ছর্বিপাক সমুদ্র-তরঙ্গে পড়ে কেবলি সে যেন কোথায় তলিয়ে যেতে লাগলো।

এমনি সময়ে চা আর কিছু জল খাবার নিয়ে মাধবী গাড়ীবারান্দায় এসে হাজির হোল! চায়ের কাপটা হাতে তুলে দিয়ে বিলাসের চিন্তাশ্রিত মুখের দৃশ্য দেখে মনে মনে রীতিমত চমকে উঠলো মাধবী!

মাধবীর চোখে চোখ পড়তেই বিলাস কৃত্রিম উল্লাসে

জীবন-সংগ্রাম

নিজেকে উল্লসিত করে বলে উঠলো,—রবীন্দ্রনাথ কি আর
সাথে লিখেছিলেন—

“সমাজ সংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব,
কেবল আঁধি দিয়ে আঁধির স্থধা দিয়ে—
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,—”

নিজের চায়ের কাপটায় চুমুক দিতে দিতে, মাধবী বলে—
“চোর যে—সে অমনিতেই ধরা পড়ে ; টাকার চিন্তায় এতক্ষণ যে
হুঁভাবনাটা মাথায় গজিয়েছিল, সেইটেকে চাপা দেবার জগুই
তো হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভবের কথাটা, মুখে ফুঠলো ? কিন্তু
ঐ-‘সমাজ সংসার মিছে সব’, কথাটা না যোগ কবলেই
পারতে ?”

কৃত্রিম ভৎসনাব সুবে সে কথান উত্তরে বিলাস বলে,—
“তোমার চাইতে মারাত্মক ছুঁড়ে মেয়ে—এ-সংসারে আব একটীও
জন্মায় নি !” .

—তা হলে আর কাল্পনিক হৃদিশার ভাবনাগুলো ভেবে লাভ
কি ! অতুলপ্রসাদ সেন লিখেছিলেন জানো তো ?—”

—“মিছে তুই ভাবিস মন,
গান গেষে যা গান গেয়ে যা
আজীবন ।

পাখীরা সব বনে বনে
গাহে গান আপন মনে,
নাই বা যদি কেহ শোনে
গেয়ে যা তুই অকারণ ।”

জীবন-সংগ্রাম

নাও এবার এস দেখি অরণের পড়া নিয়ে, ওকে শুতে দিয়ে—
খেতে বসবে চ'ল !

—“তবে তাই চলো—।” বলতে বলতেই বিলাস গানের
সুরের ভঙ্গিতে আরম্ভ কোরলো :—

“তোমারেই করিয়াছি জীবনেরি ক্রবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথ হারা !”

গানের পদ শুনে পেছন ফিরে বিলাসের মুখের দিকে
একবার হাস্য-বিনিন্দিত চোখে চেয়েই মাধবী গাড়ীবারান্দা থেকে
কক্ষের ভেতরে ঢুকে পড়লো ।

ছয়

ছপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বিলাস কোথায় যেন বেড়িয়েছে। মাধবী দেবী এই মাত্র মধ্যাহ্ন ভোজনের পালা শেষ করে, আরাম কেদারায় বসে গা এলিয়ে পান চিবুচ্ছিল! এমনি সময় তেতলা থেকে মিনাকে হাত ধরে টানতে টানতে, অরুণ এসে মায়ের কাছে উপস্থিত হোল। মিনার মুখের দিকে চেয়ে মাধবী বললো,—“ব্যাপার কি?”

মিনা মুচকি হেসে উত্তর দেয়,—“আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করুন।”

মাধবী দেবী কিছুই না বুঝতে পেরে ছ’জনের মুখের দিকেই অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

অরুণ বলে,—“মিনাদি তোমার ওপর রাগ করে কি বলেছে জানো—মা?—বলেছে তোমাদের ঘরে আর কক্ষনো আমি ঢুকবো না! তুমি মিনাদিকে গাল মন্দ করেছ হ্যাঁ—মা?”

এতক্ষণে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে মাধবী দেবী সহজ সুরে ছেলেকে বলে উঠলো,—“তোমার দিদি আমার কথা শোনে না কেন?—তাই গাল মন্দ করেছি! তা তুমি তোমার দিদিকে নিয়ে এত শীগগির এলে কেন—বাবা?”

অরুণ তখন হাত পা নাচিয়ে বললো,—“বা-রে! আমায় যে মিনাদি চকোলেট দেবে! তুমি একটা গল্প শুনিয়ে দাও না মা মিনাদিকে!”

জীবন-সংগ্রাম

—“কিন্তু আমি যদি গল্প না বলি, তবে তো আর চকোলেট দেবে না তোমাকে মিনাদি ?”

আশাহত বালক অরুণ তখন কাতর দুটী চক্ষু মেলে মিনার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তাই দেখে মিনা অরুণকে কোলে তুলে, গালে চুমো খেতে খেতে বোললো—
“তুমি কিচ্ছু ভেব না ! . এই দেখ না— ? তুমি আগে একটু ঘুমিয়ে নাও—তারপর উঠেই দেখবে ঠিক তোমার মাথার কাছে বিস্কুটের টিন আর চকোলেট কেমন প্যাট প্যাট করে চেয়ে রয়েছে ! তুমি ঘুমোও। আমি এক্ষুণি নন্দকে দোকানে পাঠিয়ে তোমার বিস্কুট চকোলেট সব আনিয়ে রাখবো !—
তুমি শোও আগে ! শুয়ে এক্ষুণি আগে ঘুমিয়ে পড়া—
তবে তো ?”

এদের কথাবার্তার মাঝখানে মাধবী দেবী বইয়ের সেনপ্ থেকে জন্ রাস্কিনের একখানি জীবনী গ্রন্থ নিয়ে তারই পাতা ওল্টাচ্ছিল। মিনা অরুণকে বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে, মাধবীর কাছাকাছি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বোললো—
“ওটা কার বই বউদি ?”

“জন্ রাস্কিনের জীবনী ! পড়েছ তুমি তার কোন বই ?”

মিনা প্রথমতঃ একটু ভাবলো। তারপর বোললো,—
“জন্ রাস্কিন্ ? সেই মহা বিদ্বান—দানবীর রাস্কিন্ ? যিনি তার শেষ জীবনের সমস্ত সঞ্চয় শুধু লাইব্রেরী আর পাঠাগার স্থাপনের কাজে দান করে গেছেন ?”

জীবন-সংগ্রাম

“—হ্যাঁ গো হ্যাঁ,—সেই নয় তো আর কে ? পড়েছ তুমি তার ‘ষ্টোন অফ ভেনিস’ বইটা ?” বলেই সে মিনার মুখের দিকে চেয়ে রইলো ।

উৎফুল্ল মিনা উত্তর দেয়,—“না তো ? আমি তাঁর ‘মডার্ন পেইন্টাস্’ বইটা পড়েছি । আছে আপনার ?” এইটেই বুঝি ষ্টোন অফ ভেনিস ?”

না—এটা তাঁরই অন্য একটা বই ? তুমি লাইব্রেরী থেকে আনিয়ে পড়ে ফেলো ।”

“—বইটা বুঝি খুব ভালো ? কি আছে বইটাতে বউদি ?”

“—আগেই যদি বলে দি তবে কি আর পড়তে আনন্দ পাবে ? বইটা এনে আগে পড়ে ফেল—তারপর একদিন তাই নিয়ে আলোচনা করা যাবে ।” বলেই অন্তমনস্কের মত কাতর দৃষ্টিতে দূরের দিকে চেয়ে মাধবী দেবী কি যেন ভাবতে থাকে ।

মিনা বার কয়েক ঘরের ভেতর পাইচারী কোরলো । একবার জানালার পথে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলো । তারপর আবার এসে সে মাধবীর কাছে চেয়ারে উপবেশন কোরলো ।

মাধবী বললো—“আজকের এমন একটা মেঘাচ্ছন্ন রবিবারে তুমি তো কৈ ঘুমোলে না মিনা ? কারো প্রেমে-টেমে পড়লে নাকি ? কেবলি ঘুরে বেড়াচ্ছ ! নানা রকম কথা বোলছ, অথচ কাজের কথাটি তো বোলছ না ? হোল কি তোমার শুনি, দাদা বাড়ী নেই বুঝি ?”

জীবন-সংগ্রাম

খিল খিল করে হেসে উঠে মিনা উত্তর দেয়,—“দাদা বাড়ী না থাকলেই বুঝি ঘুমুতে নেই? আপনার এক একটা কথা শুনলে এমন হাসি পায়! আচ্ছা বৌদি আপনার ধারণা অনুসারে, আমার ম'ত মেয়েরা—অর্থাৎ অনূঢ়া আর কুমারী মেয়েরা তো এই বয়সে শুধু প্রেমেই পড়ে! কিন্তু—আপনার মতো বিবাহিতা বৌদিরা কিসের চিন্তা করে বলতে পারেন?”

চাকরীর উমেদারী করতে ভাত কটি মুখে গুজেই রবিবারের দুপুর বেলায় বিলাস যে কোথায় বেরিয়ে গেছে, সেই চিন্তাই মাধবীকে এতক্ষণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মিনার প্রশ্নে সহসা তার চমক ভাঙ্গলো। বললো—“বউদিরা ভাবেন তাদের ফেলে আসা জীবনের পতি নির্বাচনটা সুখের হয়েছে কি দুঃখের হয়েছে সেই কথা!” বলেই সে একটু হাসলো।

গস্তীর ভাবে মাথা তুলিয়ে মিনা বলে,—“উহু! কথাটা কিন্তু ধোঁকা দেবার ম'ত শোনাচ্ছে বৌদি! বাদশাহী আমলের আগে; জয়চাঁদ, পৃথ্বীরাজ, কৃষ্ণা, পদ্মিনী, সীতা, অরুন্ধতী, প্রভৃতির মধ্যে এ রকম একটা প্রথা প্রচলিত ছিল বলে ইতিহাসে পাচ্ছি; কিন্তু এ যুগের বাঙ্গালী সমাজে এই পতি নির্বাচনের কথাটা কি আর সত্যি বউদি?”

মুচ্কি হেসে, কথাটায় একটু জোর দিয়ে, মাধবী উত্তর দেয়,—“সত্যি নয়তো কি? শুনছো না আজকাল কেবলি শোনা যাচ্ছে—মেয়েরা ভয়ানক সেচ্ছাধীন! গুরুজন-টনু তারা ছ' চক্ষে দেখতে পারে না! ট্রামে উঠে বেড়ায়, বেটাছেলের

জীবন-সংগ্রাম

পাশে বসে চাকরী করে, মিটিংএ বক্তৃতা দেয়, বিবাহ বিচ্ছেদের আইন পাশ করিয়ে নেয় ; যার তার সঙ্গে বিয়ে বসে ;—
এ সব বুঝি মিথ্যে ?”

কক্ষের ভেতরে বার কয়েক অকারণেই পায়চারি করে নিয়ে, মিনা কি যেন ভেবে নেয় কিছুক্ষণ। পরে হঠাৎ হেসে বলে ওঠে,—“কেবলি আমাকে রাগাবার চেষ্টা হচ্ছে তো ? কিন্তু আমি আপনাকে সহজে ছাড়িনি বউদি ! জন কয়েক মুষ্টিমেয় মেয়ে—পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে পড়েই হোক, আর পারিপার্শ্বিক সংসর্গ, আবহাওয়া, অথবা গুরুজনের অতিরিক্ত অস্বাভাবিক ফলেই হোক, এ কথাগুলো এ দেশে আজকাল অনেকেই রটাচ্ছেন তাদের নামে। তাই বলে এইটাই যে অবধারিত সত্য এবং প্রত্যেক মেয়ের প্রতিই এটা যে প্রয়োজ্য, সে কথা আপনি কি করে বলবেন ?”

ছেলে অক্ষয়র একটা জামা সংস্কারে হাত দিয়েছিলো মাধবী দেবী। দাঁত দিয়ে সেলাইয়ের সুতোটা কেটে নিয়ে সে বললো,—“তা হলে দেখা যাচ্ছে, পতি নির্বাচনের ব্যাপারে তোমার তেমন স্পৃহা নেই ! আমরা তা হলে বিয়েই দোষে তোমাকে—কি বল ?”

ঠাট্টার ভঙ্গিতে উচ্চহাস্য করে মিনা বলে,—“পরের মেয়ের বিয়ের জন্য আপনার অতো মাথাব্যথা কেন বউদি, নিজের একটা উপযুক্ত মেয়ে নেই বলে বুঝি ?”

“—খাকলেই কি আর আমার মেয়েকে আমি বিয়ে দিতুম

জীবন-সংগ্রাম

চট করে ? লেখাপড়া শিখে ছেলেদের মত উপযুক্ত হয়ে নিয়েই তো মেয়েদের বিয়ে বসা উচিত ! নইলে এ যুগে চলবে কি করে ?”

—“এই দেখুন বউদি ? ধরা দিচ্ছেন কিন্তু নিজেই ! আপনি বলছেন বিয়ে বসা উচিত ! তা হলেই সোজা কথায় বলছেন বিয়ে করা উচিত নয় ! অগত্যা প্রেম কবেই তো বলছেন ? তবে আর এ যুগের মেয়েদের দোষ কোথায় শুনি ?”

কৃত্রিম অপ্রস্তুতির ভঙ্গিতে মুখ খানি কাঁচুমাচু করে মাধবী উত্তর দেয়,— “আমি কি দোষের কথা বললুম ছাই ? বললুম আগে মানুষ তো হ’তে হবে ? শিক্ষাটাই হচ্ছে আসল কথা । তাই বলে আমি এ কথাও বলছি—যে এম-এ-বি-এ, পাশ করলেই মেয়েরা শিক্ষিতা হবে ! সংস্কার মুক্ত হওয়াটাই হচ্ছে মেয়েদের প্রথম এবং প্রধান কাজ ! পরিচ্ছন্নতার মানে যেমন ছুঁচি বাই গ্রন্থ হওয়া নয়, তেমনি সংস্কার মুক্ত হওয়ার মানেও, পাঁচজনের সঙ্গে এক টেবিলে বসে, যা-তা খেয়ে সেচ্ছাচারীতা অনুসরণের নামে পাশ্চাত্য সভ্যতা শিক্ষা করা নয় ।”

“এ আবার একটা মজার নতুন কথা শোনালেন বউদি ? এটা সমর্থন করতে রাজি আছি । কিন্তু এতে তো প্রেমে পড়ার মিমাংসা হোলো না বউদি ?”—মিনা উত্তর দেয় ।

“আর মিমাংসায় কাজ নেই । এবার তুমি পালাও দেখি আমি ঘরের কাজ সারবো !”

—“তাড়ালেই কি আর আজ আমি সহজে বিদেয় হচ্ছি ?

জীবন-সংগ্রাম

এই দেখুন না আপনার কাজ করে দিচ্ছি”—বলেই সে আলনা গোছাতে শুরু করে, ক্রমাগতই সেটাকে এলোমেলো করে তুলতে লাগলো।

মাধবী তাড়াতাড়ি মিনার হাত থেকে কাপড় টেনে নিয়ে হাসতে হাসতে বললো—“খুব হয়েছে থাক! যে পাকা হাত আমার গোছানো আলনাটা দেখছি কেবলি অগোছাল হয়ে উঠছে?”

ঘরের মেঝের দিকে চেয়ে তখন মিনা বলে—“ওঃ—মেঝেটাই তো দেখছি অপরিষ্কার হয়ে রয়েছে, আচ্ছা আনুন ঝাঁটা এইটেই তা হলে আগে পরিষ্কার করে ফেলি?”

মিনাকে ছুহাতে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে মাধবী বললো,—“করিতকর্মা মেয়ে যা হোক বাবা! তুমি দেবে ঘর ঝাঁট আর ঝাঁটার জোগান দিতে হবে বুঝি আমাকে?”

তারপর—আদর করে মিনাকে কোলে টেনে নিয়ে চেয়ারে বসিয়ে মাধবী প্রশ্ন করে,—“আচ্ছা মিনা তুমি আমাকে এত ভালোবাস কেন—বলতো? এত যে দূর-ছাই করি দিন রাত,—তাও কি তোমার রাগ হয়না একদিনও আমার ওপরে?”

বুকের ওপর থেকে মাধবী দেবীর জড়ানো হাত ছুখানি আঁস্টে ছাড়িয়ে, পাশের একটা চেয়ারে উঠে গিয়ে বসতে বসতে মিনা বলে,—“রাগ হয় না আবার? এই দেখুন না আপনার ছেলে ওপরে গিয়ে বিরক্ত করছিল বলে রেগে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলুম। আপনার সঙ্গে শুধু শুধু ঝগড়া করবো—তাই

জীবন-সংগ্রাম

দাদাকে বলে লেডি টিচার উঠিয়ে দিয়ে সকালে বিকেলে আপনার ঘরে আড্ডা গেড়েছি। আমার বউদি আপনাকে অপমান সূচক কথা বলেছিল বলে, দিলুম তাঁকে এমনি চটিয়ে যে—রেগেমেগে সে বেচারী দাদার সঙ্গে ঝগড়া করেই চলে গেল বাপের বাড়ীতে! এত রাগ আমার তবুও বলবেন—আপনাকে আমি ভালোবাসি ?”

সহসা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে মাধবী বলে,—“ওমা সে কি! তাই বুঝি তোমার বউদি এখানে নেই। ছিঃ ছিঃ এ সব তো সত্যিই ভালো কাজ করোনি! তাই বুঝি তোমার দাদা, গিন্নীর শোকে বিবাগী হয়ে কেবলি বাড়ী ছেড়ে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? এ রকম করলে তো সত্যিই দেখছি ছুচার দিনের মধ্যেই আমাদেরো এ বাড়ী ছেড়ে পালাতে হবে! আমাদেরো তোমার বউদি যাই বলুন না। সেজন্য তুমি তাঁকে চটাতে গেলে কে’ন বল দিকি?”

বিশুদ্ধ মুখে বিরক্তির ভঙ্গিতে মিনা বলে উঠলো—“ও—যা বউদি ওকে আবার চটাতে হয় ন্যাকি? ও তো চটেই থাকে। ওর মাথায় রয়েছে মাস্কাতার আমলের গোবর পোরা! মানুষের শিক্ষা দিক্ষা ও ছ’চক্ষে দেখতে পারে না। তা ছাড়া সংসারের অণু কোন মানুষ সুখে থাকে, তা ওর অসহ! দাদা কখন অফিস ফির্তি নিরিবিলি বসে ছুটো কাজের কথা চিন্তা করছে—না সেখানেও ওর সন্দেহ....”

খিল খিল করে হেসে উঠে—মিনার মুখের কথা কেড়ে

জীবন-সংগ্রাম

নিয়ে মাধবী বলে—“তোমার দাদার কাজ কর্মের চিন্তায় তাঁর কিসের সন্দেহ ?”

—“ও মা ! তা জানেন না আপনি ? প্রেম— ! বউদি পরকীয়া প্রেম ! মানে বউদি ছাড়া আর কারো কথাও তো দাদা ভাবতে পারে ? তা হলেই তো সম্পত্তি বেহাত ! এর পরও আপনি বউদিকে সন্দেহ করতে নিষেধ করছেন ?”

উচ্ছ্বাস করে মাধবী বলে ঠেঠে,—“জানিনে বাপু তোমার দাদা বউদির কাণ্ড ! তারপর ?”

—“তারপর আপনি ঝাঁটাটা বের করুন, আমি ওপর থেকে একবার ঘুরে আসছি ।” বলেই মিনা ছুটে ওপরে চলে গেল ।

মিনার কথাবার্তার ভেতর থেকে একটা অহেতুক কৌতূহলের সূত্র অবলম্বন করে, উৎফুল্ল মনে, গানের একটি কলি গুণগুণিয়ে মাধবী দেবী তড়িৎ হস্তে সাংসারীক কাজ সারাতে শুরু করলো !

কিছুক্ষণ পরে বোগলে একটা বিস্কুটের বাক্স আর ডানহাতে চকোলেটের প্যাকেট নিয়ে, ঘরের বাইরে থেকে বার কয়েক উঁকী ঝুঁকি মেরে, মাধবীকে দেখতে না পেয়ে, মিনা বরাবর অরুণের বিছানার পাশে এসে তার মাথার বালিশের কাছে, বিস্কুটের বাক্স আর চকোলেটের প্যাকেটটা নামিয়ে রাখলো । মাধবী তখনো হেঁসেলের কাজ নিয়ে ব্যস্ত । ততক্ষণে মিনা অরুণের পায়ের তলায় সূড়সূড়ি দিয়ে তার ঘুম ভাঙালো !

উঠে বসেই, চক্ষু রগড়াতে রগড়াতে—অরুণ ঘুম জড়ানো

জীবন-সংগ্রাম

চোখেই বলে বসলো,—“আমার চকোলেট ?” মিনা বললে,—
“হাতটা পাতবে তো ? এই নাও ! শীগগির ধরো আমি
পালাই ! চেপে ধরো না আগে এই বিস্কুটের বাস্কাটা ? মা
এসে পড়লেই তুলে রাখবে সব ! শীগগির ধরো আমি
পালাই !”

মায়ের নামে ভয় দেখাতেই অরুণের চোখের ঘুম গেল
পালিয়ে । বড় বড় করে চোখ মেলে, মিনার হাত থেকে
বিস্কুটের টিনটা আগে টেনে নিয়ে সেটাকে সে বোগলে শক্ত
করে এঁটে ধরলো । তারপর ডান হাত খানা বাড়িয়ে চকোলেট
চাহতেই, মিনা বড় একখানা চকোলেট অরুণের মুখের ভেতরে
ভ’রে দিয়েই বলে,—“চট পট খেয়ে ফেলো !” কিন্তু বালক
অরুণ সেটা মুখের মধ্যে নিয়ে, না পারলো ফেলতে,
না পারলো ওগরাতে । ঠিক এমন সময়ে মাধবী দেবী দরজার
চৌকাঠ আগলে—মিনা আর তার হেলের কাণ্ড দেখে অবাক
হয়ে চেয়ে রইল ।

হঠাৎ সামনা সামনি মায়ের ঐ মূর্তি দেখে অরুণ তো
বিস্ময়ে আর ভয়ে হতভম্ব ! ব্যাপার দেখে মিনা, পেছন ফিরে
চেয়েই মাধবাকে বলে উঠলো,—“এরই মধ্যে বুঝি আপনার
কাজ হয়ে গেল ! আমরা ভাই বোনে মিলে চকোলেট আর
বিস্কুট খাচ্ছি বলে অমন করে চোখ দিচ্ছেন কেন ! হিংসে
হচ্ছে বুঝি ?”

মিনার সে কথার উত্তর না দিয়ে, ঘরের ভেতরে ঢুকতে

জীবন-সংগ্রাম

তুকতে মাধবী বললো—“সত্যিই মিনা তুমি এ সব কোচ্ছে। কি বলতো ? পয়সা নষ্ট করে তোমাকে অতগুলো চকোলেট বিস্কুট কে আনতে বলেছিল এফুনি ?” তারপর অরুণের দিকে চেয়ে কৃত্রিম রাগত সুরে সে বললো,—“রাস্কুসে ছেলের কাণ্ড দেখে আর বাঁচিনে ! অতবড় চকোলেট-টা মুখের মধ্যে পুরে অমন হা করে চেয়ে রয়েছ কেন ! টুকরো করে ভেঙ্গে ভেঙ্গে খাওয়া যায়না বুঝি ? গাধা কোথাকার !”

মায়ের কথায় অরুণের চোখে তখন জল ভরে উঠেছে । সেই অবস্থা দেখে মিনা তাকে তফুনি কোলে তুলে নিয়ে বাইরে চলে গেল ।

একটুকুণ পরে মিনার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ধীরেন বাবু উপরে উঠে চলে গেলেন ।

সন্ধ্যা হতে তখনো অনেক দেরি । মাধবী দেবী একবার ভাবলো, মিনাকে ডাকবার কথা । কিন্তু পরক্ষণেই তার দাদার আগমনের সাড়া পেয়ে সে ব্যাপারে ক্ষান্ত হলো । অসংলগ্ন চিন্তার সূত্র ধরে ভাবতে ভাবতে সহসা বিলাসের কথা মাধবীর হৃদয় পটে উদয় হলো । লোকটা সেই যে কখন বেরিয়েছে, এখনো ফিরছে না কেন ? রাস্তার পাশের গাড়ীবারান্দার দিকে ঝুঁকে পড়ে মাধবী তখন রাস্তার দিকে চেয়ে তন্ন তন্ন করে বিলাসকে খুঁজতে লাগলো ।

সাত

বেলা দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বড় বড় সব অফিসার আর দেশ নেতাদের বাড়ী বাড়ী চাকরীর উমেদারী করে, বিলাস যখন বউবাজার আর সেন্ট্রাল এভিনিউর মোড়ে এসে পৌঁছেছে, বেলা তখন সাড়ে পাঁচটা। ছুটির দিন। ট্রাম বাসে তেমন ভিড় ছিল না, কিন্তু ফুটপাতে আর লোক চলাচলের বিরাম নেই। খানিকক্ষণ তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিলাস দেখলো! কিন্তু পর মুহূর্তেই সাংসারিক ছশ্চিন্তায় তার মনটা আবার চিন্তিত হয়ে উঠলো। সবে মাত্র বৈশাখী উত্তাপের প্রচণ্ডতা হ্রাস হয়ে আসছিল, উত্তর দক্ষিণ খোলা এই বড় রাস্তাটায় বাতাস ছিল প্রচুর, কিন্তু সে বাতাসে না ছিল শীতলতা না ছিল আরাম। তার ওপরে, মোটরের পর মোটর আর অসংখ্য পথচারীর ভিড়ে বিলাসের বুকের ভেতরটায় যেন হাঁপ ধরে উঠছিল। বেশীদূর তাকে যেতে হয় নি; রাস্তার মাঝামাঝি পথে উপনীত হবার পূর্বেই পায়ের জুতোর তলায় এক খণ্ড সড় খেয়ে ফেলা আমের ছিবড়েয় পা পিছলে সে—সেই পিচের রাস্তার ওপরেই ভয়ানক রকম একটা আছাড় খেয়ে পড়লো। ঠিক সেই সময়েই একখানা প্রাইভেট মোটর গাড়ী বউবাজারের মোড়ে সেন্ট্রাল এভিনিউতে টার্ন নেবার মুখে, হটাৎ ব্রেক কমে সহসা থেমে দাঁড়াতেই, তার ডান চাকার তলায় আটকা পড়লো বিলাসের পাঞ্জাবীর পেছনের দিক্কার দ্যোতুল্যমান প্রান্তটা।

জীবন-সংগ্রাম

এক মুহূর্তে হঠাৎ কি যে হয়ে গেল, ঠিক ঠাণ্ডর করতে না পেরে, দুই ফুটপাতের বিপুল জনতা তখন চতুর্দিক থেকে ছুটে এসে ঘিরে দাঁড়ালো বিলাস আর সেই মোটর গাড়ীটাকে। তাদের মুখে তখন, “চাপা পড়লো”—“মারা পড়লো,” রবের সে কি চীৎকার!

সহসা কিছু বুঝতে না পেরে বিলাস চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে, বিপুল জনতার সমাবেশ দেখে, লজ্জায় এবং ক্ষোভে তাড়াতাড়ি গা কাপড় ঝেড়ে উঠে বসবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তাতে প্যচ্ করে পাঞ্জাবীর প্রায়শ্চৈ মোটরের চাকার তলায় ছিঁড়ে রইল। টাল্ সামলাতে গিয়ে বিলাসকে আবার পড়তে হোলো মুখ খুঁড়ে আছাড় খেয়ে।

আসলে দুর্ঘটনাটা বিলাসের মারাত্মক কিছুই হয় নি। কিন্তু নানা মানুষের নানারূপ সহানুভূতিতে বিলাস তখন কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল!

বিপুল জনতা মোটর আর বিলাসকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তখন প্রশ্ন করতে শুরু করে দিয়েছে।

একজন বললেন,—“পা কি আপনার ছ’খানাই চাপা পড়েছিল?”

কেউ বললেন,—“কোন হাতের কজিটা ভেঙ্গেছে মশাই?”

একজন অপর এক ভদ্রলোককে লক্ষ করে বললেন,—
“কপালটা রীতিমত ফুটো হয়ে গেছে দেখছেন না? সাদা হাড় বেরিয়ে পড়েছে!”

জীবন-সংগ্রাম

একজন বললেন,—“চোখ দুটো জড়িয়ে মুখটা একেবারে রক্তে লেপ্টে গেছে যে মশাই ! চোখে লাগেনি তো ?”

এক ভদ্রলোক বললেন,—“দেখুন দেখুন মাথায় চোট লেগেছে কি না ?” পাশের এক ভদ্রলোক বিলাসের কাছে এগিয়ে এসে বিশুদ্ধ মুখে বললেন,—“দাঁচবেন তো ?”

এত লোকের এত কথার কি উত্তর দেবে বিলাস ? সে শুধু সবাইকার কথা শুনছিল আর মাঝে মাঝে এর ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল । তারপর এক সময়ে বিলাস ভয়ানক বিরক্ত হয়ে, জনতার দিকে চেয়ে, বলে উঠলো,—“আমার কিছুই হয় নি—কোথাও চোট লাগে নি । আছাড় খেয়ে শুধু এই হাত আর কপালের খানিকটা জায়গা ছড়ে গেছে ! দয়া করে আপনারা পথ ছাড়ুন—আমাকে যেতে দিন ।”

বিলাসের কথা শুনে এক ভদ্রলোক প্রায় চৈঁচিয়ে বলে উঠলেন,—“স্বচক্ষে দেখলুম লেগেছে ! আর আপনি বলবেন লাগেনি ?”

অপর একজন মন্তব্য • করলেন,—“লেগেছে—লেগেছে ভয়ানক লেগেছে, ভদ্রলোক ভয়ে বলছেন না !”

কে একজন বক্তাদের বোগলের তলা দিয়ে মাথা গলিয়ে বলে উঠলেন,—“উনি না বললেই হবে ? আমরা স্বচক্ষে দেখলুম লেগেছে । হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন নইলে কেস্ সিরিয়স্ হতে পারে ।”

এক বেটি পানওয়ালী—বগলে একটা টিনের বাস্ক আর

জীবন-সংগ্রাম

কাঁকালে পানের ঝড়ি নিয়ে দূর থেকে বিলাসের দিকে উঁকি মেরেই বললো—“আহা কি সোনার চাঁদ ছেলে গো ! রাস্তায় পড়ে প্রাণ যাচ্ছে, দেখবার লোক নেই ! কে জানে কোন অভাগীর কপাল পুড়লো !” তারপর জনতার একটু কাছাকাছি এগিয়ে এসে, সে বোললো,—“আপনারা একটু ভিড় ছাড়ুন—না বাপু ? মিনসের গায়ে একটু হাওয়া লাগুক !”

এক ভদ্রলোক তারই মধ্যে রাস্তা থেকে পুলিশ সার্জেন্ট ডেকে নিয়ে এলো । একজন গেল এম্বুলেন্সে টেলিফোন করতে ।

সার্জেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে একজন বিলাসকে প্রশ্ন শুরু করে দিল,—“আপনার নামটা কি মশাই ?”

বিলাস—“শ্রীবিলাসচন্দ্র রায় । কিন্তু.....” অপর একজন বললেন,—“চুপ করুন । যা বলছি তার উত্তর দিন । আপনার বাসার ঠিকানা ?”

বিলাস—“শ্যামবাজারের মোড়ে ।”

সার্জেন্ট—“আই ডোন্ট রিকোয়ার ছম্বাজার, টেল মি—দি রোড্ এড্রেস্ !”

“—বি থার্টিন ক্যানেল পার্ক ওয়েষ্ট !”

সার্জেন্ট—উচ্চহাস্য করে বলে—“ওট্‌স্ এ ভেরি আন্লাকি নাম্বার আই সি ?”

সার্জেন্টের সম্মুখস্থ প্রথম ভদ্রলোক হাত মুখ নাচিয়ে সার্জেন্টকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন,—“কাঙ্ক্ ইউ সি ?—দি

জীবন-সংগ্রাম

ম্যান হিমসেল্ফ ইজ আন্লাকি ! হোয়াট্ টু স্পিক্ অফ্ হিজ হাউস ?”

ভদ্রলোকের কথায় মজা পেয়ে সার্জেণ্ট হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বললে—“রাইটো—রাইটো—করক্ট ইউ আর— একজাকটলি সো !”

বিলাসকে লক্ষ করে একব্যক্তি ভিড়ের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসে বললেন—“অতো কি লিখছেন মশাই আপনারা ? হাসপাতালের ইমার্জেন্সীতে পাঠিয়ে দিন—না ভদ্রলোককে ; শেষ কি সেন্সলেস হয়ে পড়লে পাঠাবেন ?”

সার্জেণ্টের সম্মুখে দণ্ডায়মান বক্তাদের মধ্যে একজন বললেন—“উপদেশ তো দিচ্ছেন মশাই—লোক পাঠিয়েছেন এ্যাম্বুলেন্স ডাকতে ?” অপর একজন সহানুভূতির ভঙ্গিতে বললেন—“যে রকমের টন্টনে জ্ঞান দেখছি ভদ্রলোকের, তাতে তেমন যে খুব একটা মারাত্মক আঘাত লেগেছে, তা কিন্তু মনে হচ্ছে না !” পেছন থেকে কুখে উঠে এক ভদ্রলোক তার উত্তর দিলেন “খুব মনোস্ক্রহের থিয়োরী আওড়াচ্ছেন দেখছি ? মাথাটা যে খেঁতলে গিয়ে রক্তের চাপ জমাট বাঁধতে শুরু করেছে তার কি করবেন ?”

এমনি সময়ে একখানা এ্যাম্বুলেন্স এসে ভিড়ের সামনে দাঁড়ালো । সার্জেণ্ট আর পূর্ববর্তী ভদ্রলোক দু’জন অগ্রবর্তী হয়ে, বিলাসকে এ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেবার জন্ত এগিয়ে এলেন ।

জনকয়েক হটাৎ জামার আস্থিন গুটিয়ে এ্যাম্বুলেন্সের

জীবন-সংগ্রাম

সামনে এগিয়ে গিয়ে টেঁচাতে শুরু করলেন—“এধার লে আও ট্রেচার এধার—”

শেষ পর্য্যন্ত তিন চার জনে ধবধরি কবে বিলাসকে সেই ট্রেচারে টেনে তুললো।

অপ্রস্তুতের মত বিলাস ফ্যাল ফ্যাল করে তাদের দিকে চেয়ে বলে ওঠে—“কেন আমাকে সং সাজাচ্ছেন স্যাব ?” হাসপাতালে যাবার মত কিছু তো হয়নি আমার ! ছেড়ে দিন বাড়ী চলে যাই। শুধু শুধু আবার হাসপাতাল পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়ে মিছেমিছি কেন আব কষ্টটা বাড়াবেন ? আমাকে ছেড়ে দিন।”

কিন্তু জনতা বিলাসের সে কথায় কর্ণপাত পর্য্যন্ত করলো না ; তাদের নানা জনাব মাথায় তখন নানা বকমের সহাত্তির শাখা প্রশাখা, এমন গজিয়ে উঠেছে যে তারই মততায় তাঁরা তখন শশব্যস্ত ; সেখানে বিলাসের অনুরোধ শুধু অবাস্তুর নয় অপ্রীতিকর। শেষ পর্য্যন্ত ট্রেচারে উঠে বিলাসকে হাসপাতালেই যেতে হোল।

ব্যাপাব দেখে কয়েকজন মেয়েছেলে অদূরের ফুটপাথের ওপরে দাঁড়িয়েই চোখের জল মুছতে মুছতে অনুশোচনার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছিলেন। চোখের জল মুছতে গিয়ে একজন বললেন—“কি ডাকাতে সহর দেখ দেখি ? জলজ্যান্ত মানুষটাকে একেবারে মোটর চাপা দিয়ে তবে ছাড়লে !” কেউ বললেন—“হাসহাতালের গাড়ীতে যখন তুলেছে তখন কি আর

জীবন-সংগ্রাম

ঐ মানুষের জীবনের আশা আছে ?” একজন আধাবয়সী মধ্যবিত্ত ব্যক্তি ফোঁস করে একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করে বললেন, “মানুষের জীবন নিয়ে ছিন মিনি খেলা যেন এযুগের একটা রেওয়াজ হয়ে উঠেছে। বাড়ীর লোক জানলে না, দেখতেও পেল না, হয়তো হাসপাতালেই লোকটার জীবনান্ত হবে! বলিগারি কাণ্ড-কারখানা!”

বিলাসকে এম্বুলেন্সে তোলা হলে—এক ভদ্রলোক ট্রামে করে ছুটলেন তার বাড়ীতে খবর দিতে। জন দুই যুবক সত্য প্রবৃত্ত হয়ে বিলাসের পাশে এম্বুলেন্সে উঠে বোসলো। গভীর সহানুভূতির ফাঁদে আটকা পড়ে বিলাসের আকস্মিক দুর্ঘটনটা তখন নিদারুণ দুর্ভাবনায় রূপান্তরিত হয়েছে। নিরুপায় বিলাস তখন শেষ বারের মত অস্ফুটে একবার বলে উঠলো— “দেখুন দেখি কি কেলেকারীটা আপনারা করলেন ?” সে কথার প্রতিবাদ কিম্বা প্রতিউত্তর কেউ কোরলো কি কোরলো না— সেটা গাড়ির শব্দই চাপা পড়ে গেল। এম্বুলেন্স তখন ছ-ছ-শব্দে হাসপাতালের দিকে ঝুটে চলেছে।

আট

—“বউদি—ও বউদি ! টেলিফোন এসেছে—টেলিফোন !” বলেই মিনা মাধবীর ঘোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলো ।

“ওকি—তুমি অমন করে হাঁপাচ্ছ কেন ? টেলিফোন হাসপাতাল থেকে বুঝি ?—কোন হাসপাতাল মিনা ? আমায় গোপন কোরো না লক্ষ্মীটি !”

মিনা নিজেকে ততক্ষণে অনেকটা সামলে নিয়েছে—ভেতরে ঢুকে চেয়ারে উপবেশন করে সে তখন বলে,—“আপনি কি করে আগে জানলেন ?”

—“কিছুই জানিনে—শুধু মনটা বড্ড চঞ্চল হয়েছে বলেই বললুম ! মিনা, উনি বাঁচবেন তো ?” মাধবীর চক্ষু সজল হয়ে উঠলো ।

—“কি মুস্কিলেই পড়লুম রে বাবা ! এইমাত্র দাদা আমায় ডেকে বললেন—সরোজ সেবাসদম থেকে টেলিফোন এসেছে, বিলাসবাবুকে এম্বুলেন্সে করে হাসপাতালের ইমার্জেন্সীতে নেয়া হয়েছে । ওঁকে আজ হাসপাতাল থেকে ছাড়া হবে না । বাড়ীর লোক দেখতে চাইলে এসে দেখে যেতে পারেন । এক্সিডেন্ট কি মানুষের হয় না ? তাতে না বাঁচবার কি হোল ?”

—“কিন্তু কি করে তাঁকে দেখতে যাবো মিনা ? একটিবার

জীবন-সংগ্রাম

তাঁকে স্বচক্ষে না দেখতে পেলে তো আমি সুস্থ হয়ে চলাফেরা করতে পারবো না ভাই ?”

—“তা চলুন না এই তো সবে বিকেল ছ’টা। গাড়ী করে আমরা পনের মিনিটের ভেতরেই হাসপাতালের ইমার্জেন্সীতে পৌঁছে যাবো।”

গভীর বিষ্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে, করুণ মিনতির সুরে মাধবী সহসা চোখ মুছতে মুছতে ব’লে ওঠে,—“চ’ল যাচ্ছি ; পূর্বজন্মে তুমি আমার কে ছিলে জানিনে। সত্যিই তোমার দাদা অত্যন্ত মহানুভব, নইলে কার বিপদে কে আর কার নিজের গাড়ীর পেট্রল পুড়িয়ে পরের উপকার করে ? অথচ এখনো তোমাদের কাছে আমাদের তিন মাসের ভাড়া বাকী।”

হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে মিনা বলে—“তার ওপরে আবার আজকের এই হাসপাতালে যাওয়ার পেট্রলের খরচ লেডি-ড্রাইভারের বকশিস—এই সব যোগ করতে হবে তো ?” তারপর ছুটে নীচের দিকে নামতে গিয়ে বলে—“আমি গাড়ীটা বের করিয়ে আসছি, আপনি তৈরী হয়ে নিন্।”

* * * * *

উপর থেকে ধীরেনবাবু চেয়ে দেখলেন—সোফারকে পেছনের সিটে বসিয়ে, মিনা তার পাশে মাধবীকে নিয়ে হাসপাতালের দিকে রওনা হয়ে গেল। চিত্রাপিতের মত সেইদিকে কিছুক্ষণ

জীবন-সংগ্রাম

দাঁড়িয়ে দেখে তেতলার গাড়ীবারান্দা দিয়ে ধীরেনবাবু নিজের কক্ষে প্রবেশ করলেন। এতদিন এ বাড়ীতে বিলাস রয়েছে কিন্তু কোনদিনই তার স্ত্রী মাধবী দেবীকে আজকের মত এত পরিষ্কারভাবে দেখবার সুযোগ তাঁর হয়নি। বয়সের তুলনায় মিনতীর চাইতে মাধবী ছোট নয়, কিন্তু মাধবীর যে চেহারা আজ ধীরেনবাবু দেখলেন,—তাতে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন! সুপ্রিয়ার চাইতেও মাধবীর রূপ ঐশ্বর্য্য প্রচুর এবং গান্ধীর্ষ্যমাণ্ডিত—এটা তিনি সহজেই আবিষ্কার করে ফেললেন। অনিন্দশুন্দর মুখের ছুটি বিনম্র ঝাঁখি থেকে উদ্বেগ আর ব্যাকুলতা যেন মাধবীর ঝরে পড়ছিল। ছবিখানি তখনও ধীরেনবাবুর চোখের সম্মুখে ভাসছে। মাধবীর এই মুখ যে ধীরেন বাবুর কাছে আজ কত পরিতৃপ্তকর লাগলো তা শুধু মনে মনেই তিনি উপলব্ধি করলেন। ধীরেনবাবু বিলাসকে সত্যিই একজন ভাগ্যবান ব্যক্তি বলে আজ মনে স্থান দিলেন। অন্তমনস্কের মতন উদাস ছুটি চক্ষু বহ্নয়ের দিকে মেলে কত কথাই না ধীরেনবাবু আজ ভাবলেন! মিনতীর কোনও সম্ভান আজ পর্যন্ত হোল না, হয়তো সম্ভানের জননী সে হতেও পারবে না। তার একটা ব্যথা ধীরেনবাবুকে আজও আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মিনতীকে মানুষ করার চেষ্টা করে, লেখাপড়ার দিকে এগিয়ে দেবার জন্তুও তিনি যত্নের ঋণী করেন নি। কিন্তু মিনতী তা কোনদিনই বরদাস্ত করেনি,—সেখানেও ধীরেনবাবুর মনে একটা বিরাট ক্ষত পক্ষাঘাতের মত তাঁর হৃদয়ের আশা ও আনন্দকে অবশ

জীবন সংগ্রাম

কবে রেখেছে। ধীরেনবাবু জানেন মিনতীর বাপের বাড়ীতে পড়ে থাকবার মত সংগতি নেই, কিন্তু তবুও সে—যে কোনও একটা অশান্তির সূত্র ধরে অনাছত বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি করে বাপের বাড়ী চলে যায়। আজ পাঁচ দিন অতিবাহিত হতে চললো দেখে এ যাত্রায় তিনি একটু আশ্চর্য্যই বোধ করতেন। এই মিনতীর পাশে মাধবীকে দাঁড় করাতে গিয়ে সহসা ধীরেনবাবু যেন সঙ্গুচিত হয়ে পড়লেন। বাবা যা রেখে গেছেন তাহ থেকেই তার এট ক্ষুদ্র সংসার অতি স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারতো। কিন্তু তবুও তাঁকে চাকরী করতে হয় শুধু বোধ করি নিজের জীবনটাকে ভুলে থাকবার জন্য। এগেগেত্র নিজের চিত্রকে বাজী রেখে তিনি কোনদিনই চরিত্রহীন সাজবার চেষ্টা করেন নি। বন্ধুবান্ধবেরা সে জন্য তাঁকে যথেষ্ট ঠাট্টা তামাসা করেছে। এমেচার ক্লাবে নিয়ে কত জন তাঁকে দলে ভেড়াবার চেষ্টা করেছে। সন্ধ্যার পর যারা ফুল-কুমারের বেশ ধারণ করে চক্রে রঙের সূমা লাগিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে তাদের পাল্লায় পড়েও ধীরেনবাবুকে জীবনে বহুবার আতঙ্কিত হয়ে উঠতে হয়েছে, কিন্তু তবুও তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা কোনদিনই পারলো না তাঁকে তাঁর সঙ্কল্প থেকে একচুলও নড়াতে। স্বইচ্ছায় কাউকে কিছু বিলিয়ে দেওয়া যেমন ধীরেনবাবু পছন্দ করেন না, তেমন আবার কেউ সত্যিকারের কোনও অভাব অভিযোগের ফিরিস্তি নিয়ে এলে প্রয়োজনের অনুপাতে তাঁকেও তিনি সাহায্য না করে

জীবন-সংগ্রাম

থাকতে পারেন না। মিনতীকে বিবাহ করবার পর থেকে ধীরেন-বাবুর জীবনের স্ফুর্তি এবং উচ্ছসিত আকাঙ্ক্ষা তাঁর হৃদয় থেকে চির বিদায় নিয়েছে, এইটেই তাঁর জীবনের চরম ট্র্যাজিডি। মাধবীকে চাক্ষুষ দেখতে পেয়ে ধীরেনবাবুর মনে আজ এমন সব চিন্তার আনাগোনা হচ্ছিল। সহসা তাঁর পরিসমাপ্তি ঘোটলো তাঁর পুরাতন ভৃত্য নন্দহুলালের ডাকে।

নানা চিন্তার বেড়াঙ্কাল থেকে সাময়িক মুক্তি পেয়ে তিনি ভৃত্যকে প্রশ্ন করলেন—“কেউ ডাকছে আমায় নন্দ?” কঠিন নিকষ কালো একখানি পাথর খোঁদাই করা নিরেট একটি মানবদেহধারী পশু যেন এই নন্দ হুলাল! ধীরেনবাবুর একমাত্র শ্যালক ঞাড়ার সঙ্গে এর চরিত্রের একটা বিশেষ মিল যেন কোথায় রয়েছে। ওকে দেখলেই ধীরেনবাবুর হাসি পায়। ওর বাপ মরবার সময় দশ বৎসরের বালক নন্দকে ধীরেনবাবুর আশ্রয়ে রেখে যায়। সেই থেকেই ও ধীরেনবাবুর আশ্রয়ে লালিত পালিত। এখন ওর বয়স প্রায় আঠারোর কাছাকাছি কিন্তু স্বভাব এতটুকুও বদলায় নি, আর সেইটুকুই হচ্ছে ধীরেন বাবুর অবসর বিনোদনের একমাত্র ভরসাস্থল। পৃথিবীর কোন লোকের সঙ্গেই নন্দহুলালের কোনও আলাপ পরিচয় নেই। বাড়ীর ভেতরে সে একমাত্র ধীরেন বাবু ছাড়া আর কারো কথাও তেমন শোনে না। যে জন্তু তার বিরুদ্ধে একটা না একটা নালিশ বাড়ীতে রোজ লেগেই আছে। ধীরেন বাবু তা থেকেও প্রচুর হাসির খোরাক

জীবন-সংগ্রাম

প্রতিনিয়তই সংগ্রহ করে থাকেন, অথচ সেজন্য উৎকট সাধন কিম্বা পীড়ন কোনটাই তিনি নন্দহুলালকে করেন না। মিনা আর মিনতী কিন্তু ধীরেনবাবুর এহু নন্দর সঙ্গে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধটা আজ পর্যন্তও ঠিক উপলব্ধি করে উঠতে পারে নি।

“—কিরে কথা বলছিঁসু না যে? কেউ ডাকছে আমাকে?”
ধীরেনবাবু আবার প্রশ্ন করেন।

নন্দ উত্তর দেয়—“কইল্যাম যে! বাবু আইছে ছইড্যা! একটার হাতে এটা মোটা ব্যাতের লাঠা আর এটার গলায় হইল রবারের নল তার ছইধারে ছইড্যা চুঙ্গা।”

—“সে তো বুঝলুম—কিন্তু কি বললেন তোকে তাঁরা? আমার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন—তো নিয়ে এলি না কেন ওপরে?”

—“হুঃ—সামনে যাইতেই না যাইতেই তাইড্যা আসে লাঠা লইয়া মারতে! আবার আমারে কয় তুমি কেডা? যত কই নন্দহুলাল তত কয় তোমার বাবুর ডাকো! আমার বাবুর দায়ড্যা পড়ছে কি তার কাছে যাওনের? তারা আইথে পারে না?”

এমনি সময়ে ধীরেন বাবুর কক্ষের দরজায় রেবতীবাবু এসে উপস্থিত হলেন সঙ্গে ক্ষীরোদ ডাক্তার। ধীরেন বাবুর দিকে চেয়েই রেবতী বাবু বলে উঠলেন,—“এই যে আমরা নিজেরাই এসে উঠলুম আপনার তেওলা পর্যন্ত সে জন্ম বেয়াদবি মাপ করবেন!”

ব্যতিব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে ধীরেন বাবু বললেন,—

জীবন-সংগ্রাম

“তাতে কি হয়েছে ? আশুন আশুন আজ যে আমার পরম সৌভাগ্য দেখতে পাচ্ছি ! এই সন্ধ্যা রাত্রিতে গরীবকে হঠাৎ কি মনে করে ? দাঁড়িয়ে রইলেন যে—বসুন না আপনারা !

—ওরে নন্দ খান ছুই চেয়ার নিয়ে আয় তো মিনার ঘর থেকে !”

চেয়ারে উপবেশন করে রেবতীবাবু শুরু করলেন,—আপনার “বাড়ীটা আজ বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগছে না ?”

মুচ্কি হেসে ধীরেনবাবু উত্তর দিলেন,—“হ্যাঁ খানিকটা ফাঁকা ফাঁকাই বটে ! কেউ গেছেন বাপের বাড়ী, কেউ গেছেন হাসপাতালে !”

“হাসপাতালে ! কেউ অসুখ বুঝি ? কোন্ হাসপাতালে ?”
—“সরোজ সেবা সদনে । একটু আগেই সেখান থেকে ফোন এসেছিল—আমার নীচেকার ভাড়াটে ভদ্রলোকের এক্সিডেন্ট হয়েছে বলে । আমার ভগ্নী মিনাও তাদের সঙ্গেই গেছে ! তারপর আপনার খবর কি বলুন” বলে ধীরেনবাবু উৎসুক নয়নে ক্ষীরোদ ডাক্তারের দিকে একবার চাইলেন ।

চশমাটা পরিষ্কার করে নিয়ে রেবতীবাবু একটু গুছিয়ে বসলেন । তারপর বললেন—“এই সন্ধ্যা রাত্রিতে যে আসতে পারলুম এওতো হয়ে ওঠেনা ধীরেনবাবু । কবে সেই ব্যাঙ্কে গিয়ে আপনাকে বলেছি অথচ দেখুন এসে উপস্থিত হলুম কবে !”

—“তা-অমন হয় ! আপনার তো আর একটা কাজ নয়,

জীবন-সংগ্রাম

কতদূর এগিয়ে নিলেন হাসপাতালের কাজ ? কি নাম যেন হাসপাতালটির সেদিন বলছিলেন ?”

—“একটু আগে তো আপনার মুখেই তার নাম উচ্চারণ হ’ল !” বলেই রেবতীবাবু একগাল হাসলেন ।

ক্ষীরোদ বললো—“সরোজ সেবা সদন !”

অতিরিক্ত মাত্রায় বিস্মিত হয়ে ধীরেনবাবু বললেন—“ও— তাই নাকি ? এ্যারেঞ্জমেন্টে তা’হলে এরি মধ্যে আপনারা কম করেন নি ? আপনিও বুঝি ওখানকার একজন ডাক্তার ?”

ক্ষীরোদ ডাক্তার একটু হেসে শুধু রেবতীবাবুর দিকে মুখ তুলে চাইল !

ক্ষীরোদের হাসি দেখে রেবতীবাবুও একটু হাসলেন । তারপর ধীরেনবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—“ওর কথাই সেদিন আমি আপনাকে বলছিলুম । উনিই হচ্ছেন ডাক্তার ক্ষীরোদ কুমার চৌধুরী !”

কথা শুনে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি ধীরেনবাবুর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লো—“ইনিই জার্মান ফেরৎ ডক্টর কে. চৌধুরী ? এত অল্প বয়সে এত বড় মেটাল স্পেশালিষ্ট ডাক্তার হয়ে এদেশে ফিরে, এমনি নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারে ব্রতী হয়েছেন ?” তারপর ধীরেনবাবু নন্দহুলালকে ডেকে চা এবং জলখাবার আনতে পাঠালেন ।

রেবতীবাবু বললেন—“জ্ঞানী এবং গুণীর মূল্য এদেশের লোক আজও দিতে শেখেনি ধীরেনবাবু ! ওতো ডাক্তার ওর

জীবন-সংগ্রাম

কথা ছেড়ে দিন ! এই দেশের মুক্তির জন্ত আমরা কোন্ মহা বিপদ ঘাড়ে নেইনি বলতে পারেন ? সেই ইংরেজ জাতকে বাধ্য তো করেছি দেশ ছেড়ে যেতে ? কিন্তু তা করলে কি হ'বে ! কংগ্রেসের ভেতরে যে দলাদলি আজ শুরু হয়েছে তার পরি-সমাপ্তি ঘটতে কত বৎসর এই দেশের লোককে আরো কত খেসারত দিতে হয় তাই আগে দেখুন !”

“আপনি কি বলছেন বর্তমান কংগ্রেস, ইংরেজের হাত থেকে শাসনভার হাতে নিয়েও ভারতবর্ষের সুখ-সম্পদ ফিরিয়ে আনতে পারবে না ?”

—“হয়তো পারতো ! কিন্তু একদিকে যেমন এদেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবার দলের অভাব নেই, অন্যদিকে নেই তেমনি রাজনীতি পরিচালনা করবার সুস্থ মস্তিষ্ক ! হুজুগে মেতে একটা সাময়িক জেদ বজায় রাখবার জন্ত অকাতরে জীবন বিসর্জন দেবার মানুষের অভাব এদেশে কোনকালেই নেই, কিন্তু শান্ত মনে, স্থির মস্তিষ্কে, এমনি একটা বিভিন্ন মতাবলম্বী ছত্রিশ সম্প্রদায়ের দেশে, রাজনীতি পরিচালনা করবার লোক দেখতে পাচ্ছেন কি আপনারা একটিও ?”

“তাতো বটেই,” বলে ধীরেনবাবু শুরু করলেন—
“ইন্ডিপেন্ডেন্স্ ডে তো ক্রমেই এগিয়ে আসছে । কার হাতে দেশ শাসনের বড় দায়িত্বের ভার পড়বে শুনতে পাচ্ছেন কিছু ?”

—“শুনে আর কি হবে ? দেখতেই তো পাবেন সব দু'দিন.

জীবন-সংগ্রাম

পরে। আচ্ছা এখন আমাদের সরোজ সেবা সদনের কয়টা কথা এবং কাজটুকু সেরে আমরা উঠে পড়তে চাই।”

এমনি সময়ে নন্দ ছ'বাটি চা এবং ছ'প্লেট জলখাবার এনে ক্ষীরোদ ডাক্তার এবং রেবতীবাবুর হাতের কাছে টেবিলে রেখে গেল।

দক্ষিণ হস্তের কাজ শুরু করে দিয়ে বেবতীবাবু বললেন,—
“সেদিন আমি শুধু এই ডাক্তারের বিদ্যাবুদ্ধি ধৈর্য্য এবং কর্ম-কুশলতার পরিচয় আপনাকে দিয়েছিলাম। আজ শুনে রাখুন ইনি হচ্ছেন আমার বাল্যবন্ধু সরোজ রায় চৌধুরীর একমাত্র স্নযোগ্য পুত্র!”

—“কোন্ সরোজ রায় চৌধুরী বলুন তো?”

—“ব্যারিস্টার সরোজ রায় চৌধুরী যাঁর ব্যারিস্টারীর যশ এবং অর্থের প্রাচুর্য্য এ সহরের কাব্যে সঙ্গেই আজ আর তুলনা করা চলে না! অথচ সেই সরোজ তাঁর এই ছেলের মেন্টাল হাসপাতালের জন্য এতটুকুও সাহায্য করতে অগ্রসর হয়ে এলোনা।”

—“সে কি রেবতীবাবু! সরোজবাবু তো শুধু ব্যারিস্টারই নন! তিনি যে মস্ত জমিদার! অস্তুতঃ আমার তো এটুকু জানা আছে, আজ এ সহরের যে কয়টা বড় ব্যাঙ্ক রয়েছে তাঁর কোনটাতেই সরোজবাবুর বড় কম টাকা ডিপোজিট নেই! আমার তো মনে হয় সরোজবাবুর জমানো টাকার সুদ থেকেই আপনাদের ঐ হাসপাতাল অতি স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারে,

জীবন-সংগ্রাম

উপরন্তু আরো অনেক কিছু করা যায়। তাঁর মতন ধনবান-ব্যক্তি এমন একটা জনহিতকর কার্যের প্রতি বিরূপ হবার কারণটা তো সত্যিই একটু রহস্যময় বলেই মনে হচ্ছে!”

—“রহস্য যে কিছুটা রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই!— তিনি চেয়েছিলেন ছেলের বোজগারেব জন্ম একটা চেম্বার খুলে দিতে; নয়তো ভারত গভর্নমেন্টের কাছে চাকরী করাতে! ছেলের উচ্চশিক্ষার জন্ম টাকা তিনি অকাতরে খরচ করে-ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু তাই বলে, সরোজ এটা চায়নি যে—তার ছেলে গোড়াতেই অর্থ বোজগারেব কথা ভুলে এই ভূতুড়ে দেশের মানুষের স্মৃতিকিৎসার জন্ম ডোনেশন তুলে চ্যারীটেবল ডিস্‌পেনসারী নিয়ে অকাবণে খেটে মরবে। বুঝিয়ে-ছিলুম তাকে আমি অনেক, এবং ক্ষীরোদের পক্ষ নিয়েই বলেও ছিলুম—কিছু টাকাকড়ি সাহায্য করবার জন্ম; কিন্তু তাতে সরোজ শুধু মুখটা অণুদিকে ফিরিয়ে নিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে আমাকে বলেছিল—‘নিজে তো কংগ্রেস কবে দেশকে উদ্ধার করে দিলে—ওর পেছনে উসকানি দিয়ে আবার আমাকে ব্যতিব্যস্ত করা কেন?’ সেই থেকে সরোজের কাছে যাতায়াত কবাই আমার বন্ধ করে দিতে হয়েছে। ক্ষীরোদকে দেখছি একটা সত্যিকারের ভালো কাজে লেগেছে! কাকাবাবু বলে ডাকে, তা ছাড়া এ পোড়া দেশে এ রকমের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হলে যে কত গরীবের উপকার হবে তার ইয়ত্ন নেই! তাতেই ওর হাসপাতালের কিছুটা কাজ আমাকে বাধ্য হয়েই

জীবন-সংগ্রাম

করতে হচ্ছে। দেশের এই কাজের জন্ত যদি আপনারাও আন্তরিক সাহায্য করেন, তাহলেই সরোজও একদিন বুঝতে পারবে তার ভুল।”

—“সে তো নিশ্চয়ই—আমাদের আর শক্তি কতটুকু? তবুও তারি ভেতরে, যতদূর সম্ভব আমি তা করবো;—অধিকন্তু আমার পরিচিত ধনী বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে যতটুকু সাহায্য আমি আপনাদের হাসপাতালের জন্ত ব্যবস্থা করতে পারি, সে চেষ্টারও বিন্দুমাত্র ক্রটি হবে না।”

ধীরেনবাবুর কথা শুনতে শুনতে উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষীরোদ ডাক্তার বলে,—“আপনার এই প্রতিশ্রুতিই আমার কাছে যথেষ্ট!” তারপর রেবতীবাবুর দিকে ফিরে চেয়ে সে বোললো—“চলুন কাকাবাবু রাত হয়ে যাচ্ছে হাসপাতালেও একবার যেতে হবে।”

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে রেবতী বাবু বললেন—“যেদিক থেকে যতটুকু পারেন তাই করবেন তা হলেই হাসপাতালের মারফতে দেশের লোকের প্রচুর উপকার করা হবে।”

প্রতি নমস্কার জানাতে জানাতে ধীরেনবাবু উত্তর দিলেন,—“আমাকে আর অযথা লজ্জা দেবার চেষ্টা করবেন না! এ কাজ তো আপনাদের একলার নয়, এ যে আমাদের কাজ সে কথা তো ভুলতে পারবো না রেবতীবাবু।”

ক্ষীরোদ ডাক্তারকে নিয়ে রেবতী বাবু চলে যাবার কিছুক্ষণ পরই নীচে গাড়ীর শব্দ পেয়ে ধীরেন বাবু তেতলা থেকে ঝুঁকে

জীবন-সংগ্রাম

দেখলেন—বিলাসকে নিয়েই এঁরা গাড়ী থেকে নামছেন। মনে হ'ল যেন বিলাসের কপাল জুড়ে একটা বিরাট ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রয়েছে।

মাধবী দেবী ও বিলাস অরুণকে নিয়ে দ্বোতলায় তাদের ফ্লাটে প্রবেশ করতেই মিনা বরাবর তেতলায় উঠে গিয়ে ধীরেন বাবুর কক্ষে প্রবেশ করলো।

মিনার অপেক্ষাই করছিলেন এতক্ষণ ধীরেন বাবু। তাকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখেই এগিয়ে এসে তিনি প্রশ্ন করলেন,—
“বিলাস বাবু কি ফিরে এলেন?”

“হ্যাঁ! শুধু হাতের কনুই আর কপালের খানিকটা জায়গা রাস্তার পিচের ওপরে আছড়ে প'ড়ে ছ'ড়ে গিয়েছিল—আর কিছুই হয় নি!”

বোনের কথা শুনে ধীরেনবাবু অনেকক্ষণ পরে যেন বুকের রুদ্ধ নিশ্বাস মোচন করে বাঁচলেন। বললেন—“যাক তাই ভালো! খুব বাঁচা বাঁচলেন—তা হলে ভদ্রলোক!” তারপর তিনি সুস্থ হয়ে চেয়ারে বসে বাইরের দিকে চেয়ে বললেন।
“হাসপাতালটা কেমন দেখলে মিনা?”

পায়ের জুতোটা খুলতে খুলতে মিনা বলে—“ভারি চমৎকার দাদা! বিলাসদার কি-ই বা দুর্ঘটনা হয়ে ছিল? তার জন্ম তাকে নিয়ে সেকি যত্ন! আমরা যেতেই আমাদেরি না কত আদর যত্ন দেখালে! আমরা না গেলে বিলাসদাকে আজ ওরা হাসপাতাল থেকে কিছুতেই ছাড়তো না! নাস'

জীবন-সংগ্রাম

ডাক্তার গুলোই না কি চমৎকার ! দেখলেই ভক্তি হয় । ডাক্তার ঘোষ ব'লে এক ভদ্রলোক বৌদির সঙ্গে কত কথা বোললেন । আমার এতো ভালো লাগলো শুনে যে তা বোললে ফুরায় না ! শুনলুম কে এক জন-মস্ত বড় লোকের ছেলে ডাক্তার কে. চৌধুরী নাকি ঐ হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা করেছেন । তিনি নিজেই সব দেখাশুনা করেন ।”

—হাসতে হাসতে ধীরেন বাবু বললেন—“দেখা হ'ল তাঁর সঙ্গে তোমাদের ?”

—“না হয়নি তো ! আমরা যে সময়ে গিয়েছি শুনলুম ঐ সময়ে প্রায় দিনই তিনি হাসপাতালে থাকেন না । কিন্তু ডাক্তার ঘোষ বললেন তিনি নাকি ঐ হাসপাতালেই রাত্রিযাপন করেন !”

মুচকি হেসে ধীরেনবাবু বললেন—“এই তো তোমরা আসবার একটু আগেই তিনি এখান থেকে চলে গেলেন ।”

—“কে ?—ডাক্তার কে. চৌধুরী ? সত্যি তিনিই তোমার কাছে এসেছিলেন ! কেন দাদা তিনি এসেছিলেন ? তবে কি ব্যাঙ্কে...” “—না রে—না ! হাসপাতালটার উন্নতির জন্তু আমার বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে কিছু ডোনেশন ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্তু অনুরোধ করতে এসেছিলেন । ডাক্তারী পড়বার ইচ্ছে যদি থাকে তবে ব'ল আমি ঐ হাসপাতালে তোমার পড়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি ।” মিনা বলে—“আমি এফুনি রাজি !”

জীবন-সংগ্রাম

ওদিকে ঘরে ঢুকেই বিলাস বললো—“দাঁড়াও আগে সুস্থ হয়ে বসতে দাও । চেষ্টামেচি করো না—কিছু হয়নি আমার !” মাধবীর চোখে তখন জল এসে পড়েছে, বললো—“দরকার নেই তোমার কাল থেকে বাইরে বেরিয়ে ! নিশ্চয়ই গাড়ী চাপা পড়েছিলে ! কো'ন জায়গা ভেঙ্গে টেঙ্গে যায়নি তো ? হাতটা তো নিশ্চয় মস্কে গেছে—দেখতেই পাচ্ছি !”

বিলাস দুহাত নাচিয়ে বলে উঠলো—“দেখ, বেলা পাঁচটা থেকে রাস্তার লোকগুলো আমার পেছু নিয়ে—হাসপাতালের ইমার্জেন্সী ডিপার্টমেন্ট পর্যন্ত ঢুকিয়ে তবে ছেড়েছে । যদি বা কোন মতে হাসপাতালের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে বাড়ী ফিরলুম,—তুমি দেখছি আবার শুরু করলে ?”—

“তার মানে তোমার কিছুই হয় নি ? আর ছনিয়ার যত লোক তাদের তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, কোথায় তারা তোমার ভাল করলো—না তারাই হোল তোমার সব শত্রু ?”

গায়ের জামাটা খুলতে খুলতে বিলাস বললো—“না সবাই আমার মিত্র আর তুমি হলে তার জ্বলন্ত চিত্র !”

—“কি হয়েছিল বল না শুনি ? কোথাও সেক টেক কিছু করতে হবে না তো ? খাবার ঔষধ কোথায় ? আমারও মনে পড়লো না তখন, কিন্তু কি হবে তা'হলে ?” মহা অসহায়ের মত কাতর অথচ বিরক্তির সুরে বিলাস বললো, “কুইনাইন নিয়ে এসো ! আর নিয়ে এসো তোমার যা যা যন্ত্রপাতি আছে ! তারপর তুমি আবার একবার ডাক্তারী শুরু করে দাও ! উঃ—

জীবন-সংগ্রাম

কি কুক্ষণেই আজ ঘুম থেকে উঠেছিলুম ! শেষকালে ব্যাটারা আমাকে চিকিৎসা শঙ্কটের নন্দ বানিয়ে তবে ছাড়লে ? ধনু স্হর বাবা কলকাতা ! পেন্সাম হই !”

—“চিকিৎসা শঙ্কটের নন্দ মানে ? হয়েছিল কি তোমার ?”

—“আরে হয়েছিল ছাই । পায়ের জুতোর তলায় আমার ছিবড়ে পড়ে পা পিছলে আছাড় খেয়েছিলুম, আর ঠিক সেই সময়েই আমার গা ঘেঁসে একটা মোটর এসে দাঁড়িয়েছিল । আর যাবে কোথায় ? এককাড়ি লোক এসে চেষ্টামেচি শুরু ক’রে দিল ! যত বলছি আমার কোথাও লাগেনি, তত সেই বিরাট জনতা-পারে তো আমায় মারে আর কি ? সাথে আর বলেছে দশচক্রে ভগবান ভূত ! হাসপাতাল অবধি নিয়ে তবে বেটারা আমায় ছাড়লে ?”

—“মোটর তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল কেন ?”

—“জিজ্ঞেস করে এসো গিয়ে সে কথা—সেই মোটর ডাইভারকে ; আমি কি জানি ?

সাথে আর রাবীন্দ্রিক ছন্দে বলতে সাধ হয় !

ধনু তোমারে হে মহা নগরী

চরণ পড়ে নমস্কার,

দাও ফিরে মম সাবেক দেহটা

লহ ব্যাণ্ডেজ পুরস্কার ।”

—“ওমা এরই মধ্যে তুমি ব্যাণ্ডেজগুলো খুলছো যে গো ?”

—“ঘুমুতে হবে না ? তুমিও কি আমাকে পাগল পেলেন নাকি ?

জীবন-সংগ্রাম

মাঝখান থেকে ডাক্তারগুলো বাঁ হাতটায় একটা স্ফুট ফুটিয়ে দিয়ে এমন ব্যথা করে দিলে, যে, এখন এই সুস্থ শরীরে বসে বসে নুনের সৈক না দিতে হলে বাঁচি !”

—“হাতে অত বড় একটা খাম কিসের গো ? ওটা কোথা থেকে এনেছ ?”

—“দাঁড়াও ! সেই কথাই তো বোলবো ! চাকরি ! চাকরি ! রেডিমেড্ চাকরি । নগদ ছ’শো টাকা মাইনে ! অথচ কিছুই করতে হবেনা বুঝলে ? স্রেফ্ পলিসি বেচ দিলেই হোল ! জগৎটাই হচ্ছে শুধু পলিসি আর পলিসি ।” তারপর বিলাস হাসতে হাসতে বোল্লো, “ওঃ—তুমি যদি শুনতে সেই ভদ্রলোকের কথা, তো হেসেই খুন হ’তে ! বল্লে কি জানো ? ডিক্‌নারীর বাছা বাছা সব কথা—”

“Charity begins at Home.”

“Try your next door neighbour.”

মাধবী হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে,—“তার মানে ?”

—“আঃ সব কথারই মানে শুনতে চাও কেন ? দাঁড়াও না ভদ্রলোকের ‘charity begins at home’ কে আমি কালকেই ধরছি গিয়ে ঘেচাং কবে ; আপত্তি তুলেই বলবো আপনি আমার next door neighbour. Policy কিম্বন ! ছ’দিন পরেই তো বাড়ী ভাড়ার তাগাদা করতে ছুটে আসবেন, Policy না কিনলে টাকা দেবো কোথা থেকে ?”

জীবন-সংগ্রাম

—“কি-যে হেঁয়ালি আরম্ভ করেছ ! কে তোমার next door neighbour ? পলিসি আবার কিনবে কি ?”

—“আঃ—হা হা, সোজা কথাটাও বুঝলে না ? Insurance policy. আর সেটা করাবো প্রথমেই আমাদের ধীরেনবাবুকে ?”

—“তাঁর বয়ে গেছে তোমার কাছে Insurance করতে ! তাঁর বুঝি Life Insurance করা নেই তুমি মনে করেছ ?”

—“অধিকন্তু নঃ দোষায় ? চ’ল খেতে দেবে !”

—“তুমি কি আবার রাত্রে খাবে ? উপোস করলে হতো না ? ব্যথা বিষণ্ণলো তা হলে কমতো !”

—“বলছি আমার দেহের ত্রিকূলে নেই ব্যথা বিষ । আর অমনি তুমি বালি পথ্য দেবার ব্যবস্থাটা পর্য্যন্ত বাদ দিয়ে—একেবারে উপোসের অবস্থা করলে ? আচ্ছা গিন্নী তুমি যা হোক ! চল ?”

—“আমি ঠাট্টা কচ্ছি না, তুমি বরং এক কাপ চা খেয়ে থাকো !”

—“ওর চাটতে তো দেখছি হাসপাতালই ছিল ভালো—ওরা তবু একবারটা গরম দুধ খাইয়েছিল । তা হলে সেই-খানে থাকলেই তো পাত্তুম ? কে তোমাকে ধীরেনবাবুর গাড়ির পেট্রোল পুড়িয়ে সেখানে যেতে বলেছিল ?”

—“তবে খাবে চ’ল আমার কি ? অসুখ বিশুখ হলে নিজেই ভুগবে !”

“এই তো প্রেসীর মত কথা ? চ’ল—চ’ল । উঃ কি তাজ্জব

জীবন-সংগ্রাম

সহর কলকাতা ! কলম পিষে আর দশটা ছ'টা চাকরী করে
সহরটার চেহারা এই প্রায় ভুলে গিয়েছিলুম, বাপ্‌স্ !—নাও
শীগগির চল !”

নয়

গড়িয়াহাটার বন্ধিষ্ণু পল্লির অনতিদূরে একটি নিরান্না বড়
ল্যাণ্ডের ওপর বিখ্যাত ব্যারিস্টার সরোজ রায় চৌধুরীর প্রকাণ্ড
বাড়ীটা সহজেই পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঝি, চাকর,
দ্বারোয়ান আর স্ত্রী লতিকাকে নিয়েই তাঁর শেষ জীবনের
দিনগুলি যেন টিমে তালে চলতে শুরু করেছে। সুসজ্জিত
প্রাসাদ সমতুল্য এমন যার বাড়ী, তিনটা বিলিতি ব্যাঙ্কে কম
পক্ষেও যার প্রায় আট-দশ লক্ষ টাকা লগ্নী কারবারে
খাটছে ;—হাঁক করতেই যার দাস দাসী চাকর চাকরানী ব্যস্ত
সমস্ত হয়ে কাছে ছুটে আসে ;—তার মত ব্যক্তির মনেও আজ
আর কোন সুখ নেই ! এ যেন নিয়তির একটা প্রচ্ছন্ন পরিহাস !

ছোতলার প্রকাণ্ড হল ঘরটায় বসে সরোজ রায় তাঁর স্ত্রী
লতিকার সঙ্গে কথোপকথনে মত্ত ছিলেন,—এমনি সময়ে
কোঁচের পাশের টিপয়ের উপর থেকে হঠাৎ টেলিফোন বেজে
উঠলো ; লতিকা রিসিভারটা তুলে ধরেই বললেন—“হালো—
কাকে চান ?”

ওধার থেকে উত্তর এলো,—“সরোজ বাড়ী আছে।” সে
কথার উত্তর না দিয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা স্বামীর হাতে

জীবন-সংগ্রাম

তুলে দিয়ে লভিকা বললেন,—“তোমায় রেবতী বাবু ডাকছেন !”
স্ত্রীর কথায় তাড়াতাড়ি রিসিভারটা কাণের পাশে নিয়েই সরোজ
বললেন,—“কে রেবতী ?—কে’ন ডাকছেো ভাই ?”

রেবতী বাবু ওপাশ থেকে উত্তর দিলেন,—“তোমার সঙ্গে
একটু আলাপ করবার জন্য অমনিতেই ডাকছিলুম !” তারপর
বললেন,—“তা কেমন আছ তোমরা ? ডেকে ডেকে তো
টেলিফোনে তোমাদের আজকাল পাওয়াই যায় না ?”

—“তার মানে ? না ডেকেই বোলছো পাওয়া যায় না ?”

—“ডাকলেই কোনদিন শুনি এন্গেজড্ কখনো বা শুনি
নো-রিপ্লাই ! আজকাল কর্তা গিন্নী দুজনেই বুঝি বাড়ী
থাকোনা ?”

—“উচ্চহাস্য করে সরোজবাবু বললেন—“কোন্ চুলোয়
আর যাবো বেলো ? বাড়ীর বাইরে যে একটা জগৎ রয়েছে
আমরা তার খোঁজ রাখিনা বহুকাল ! সেক্ষেত্রে নো রিপ্লাই
তো হবার কোন চাঙ্ নেই। টেলিফোনের পাশেই তো
বসে রয়েছি সর্বক্ষণ !”

“তা হয়তো থাকো, কিন্তু আমি আবো দুদিন ডেকেছি
তোমাদের কাউকেই পাইনি—তাই অভিযোগ করছি। সে
কথা যাক ! এখন বলছি কি শোন।”

—“বল ভাই প্রাণ খুলে বল ; শুনছি।”

—“তেমন নতুন কথা কিছু নয়। তবে তোমার পক্ষে
হয়তো একটা সুখবরও হতে পারে !”

—“আমার পক্ষে সু-খবর ? হাসালে রেবতী ! ত্রিকূলে

জীবন-সংগ্রাম

যার সব থেকেও কেউ নেই ; নিজের সন্তান যার পর হয়ে যায়, তার পক্ষে কি আরও কোন সুখবর এ ছনিয়ায় থাকতে পারে ?”

—“আছে আছে সত্যিই সুখবর ! তোমার ছেলে ক্ষীরোর মেন্ট্যাল হাসপাতালটা যে প্রায় দাঁড়িয়ে উঠলো হে ? পারি তো একবার যাবো আজ বিকেলে তোমার ওখানে—বোলবো’খন সব গিয়ে ।”

—“আচ্ছা এসো ! রিসিভার রেখে দিচ্ছি তা হলে ?” রিসিভারটা টেলিফোন বক্সের গায়ে নামিয়ে রেখেই সরোজবাবু লতিকা দেবীকে বললেন,—“রেবতী আমাকে আজ সুখবর দিয়ে রাজা করে দেবে বুঝেছ ? ক্ষীরোর মেন্ট্যাল হাসপাতাল নাকি দাঁড়িয়ে গিয়েছে ।”

দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠা থেকে মুখ তুলে স্বামীর দিকে চেয়ে লতিকা বললেন,—“টাকাকড়ির কিছু দরকার পড়েছে বলেই তোমার ছেলের নাম দিয়ে সুখবর একটা কিছু না জানালে চলবে কে’ন ? অগত্যা ধৈর্য ধরে বিকেল পর্যন্ত থাকো ! তবে রেবতীবাবু আজ কিছু না আদায় করে যে ছাড়ছেন না—এটুকু বেশ বোঝা যাচ্ছে ।” বলেই লতিকা আবার সংবাদ পত্রের দিকে মনোনিবেশ করলেন । ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে ট্রে ভক্তি চায়ের সরঞ্জাম সমেত জল গরম রেখে, রেডিওটা খুলে দিয়ে গিয়েছিল । কালোয়াতি সুরে একটা হিন্দী গান সেখানে বাজতে শুরু কোরলো ! রেডিওর গানে সরোজবাবুর চিন্তাজাল

জীবন-সংগ্রাম

সহসা ছিন্নভিন্ন হয়ে গে'ল। লতিকা এক কাপ্‌চা আর কিছুটা হালুয়া সরোজবাবুর পাশে একটা টিপয়েতে রেখে খেতে বললেন।

রেডিওর হিন্দী গানটী তখন ভালোভাবে রীতিমত জমে উঠেছে। সহসা লতিকা বলে উঠলেন—“ওগো থামিয়ে দাও, আর ভাল লাগে না।”

রেডিওটা সহসা বন্ধ ক'রে উদাস বিষণ্ণভাবে দূরের দিকে চেয়ে, সে কথার উত্তরে সরোজবাবু বললেন,—“ভালো তো লাগবার কথা নয় লতু, কিছুই আর ভাল লাগে না।” তখন লতিকা বললেন—“ক্ষীরো যে শেষকালটায় আমাদের সঙ্গে এমনি বেইমানি করবে, এতটা আমি ধারণাও করিনি কোনদিন!” তারপর চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে তিনি বলে উঠলেন—“ছুটো মাত্র ছেলেমেয়ে যে এত অবাধ্য হ'তে পারে। একথা ভাবতেও আমার মাথা ঘুরে ওঠে!”

একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করে ব্যারিস্টার বললেন—
“মাথা আমাদের হয়তো নেই লতু, সেইজন্যই মাথাটা আমাদের ঘোরে! এ যুগে শিক্ষার ক্রমোন্নতির কথাই দেশে দেশে শোনা যায়; কিন্তু এ পোড়া দেশের ছেলে মেয়েগুলো যত শিক্ষা দিক্ষা পাচ্ছে তত যেন অবনতির অতল তলে ডুবে যাচ্ছে। আজ উচ্চ শিক্ষার নামে দেশের শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা বিজাতীয় কুৎসিত অনুকরণের সেবা করে চলেছে।”
তারপর খানিকক্ষণ থেমে সরোজ বাবু আবার শুরু করলেন—

জীবন-সংগ্রাম

“মানসিক চিকিৎসা বিজ্ঞায় প্রথম স্থান অধিকার করাবার জন্য ক্ষীরোকে আমি প্রথমে জার্মানীতে, এবং শেষে ইয়োরোপের প্রত্যেকটি বড় প্রতিষ্ঠানে ঘুরিয়ে এনেছি। সেই ক্ষীরো আমার দেশে ফিরে এলো ডাক্তারীর উঁচু ডিগ্রী নিয়ে।” তারপর অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ব্যারিস্টার বলে উঠলেন,—“ওর বয়স আর কোয়ালিফিকেশন্ দেখে স্বয়ং ভারতগভর্নমেন্ট ওকে চাকরিতে বহাল করতে চাইল,—ও গ্রাহ্যই কোরলো না সে চাকরি! শেষে দেখলে তো হতভাগার ভেজ? আমি ওকে স্পেশাল চেম্বার খুলে দিতে চাইলাম। নাঃ তাতেও ওর চললো না! নিজেই উনি হাঁসপাতাল খুলে এদেশে যত গরীব দুঃখী আছে তাদের বিনি পয়সায় চিকিৎসা করে উদ্ধার কবে দেবেন! এতবড় ইডিয়ট ত্রিভুবনে আর জন্মেছে বলে শুনেছো?”

লতিকাদেবী কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন,—“এদের মাথায় যে একটা বন্ধমূল ধারণা ঢুকে বসে আছে কি না? ক্ষীরোর কথাই ব’ল, আর মাধবীর কথাই ব’ল, বাপ্ মা সম্বন্ধে ওদের ধারণাই হোল যে, আমরা ছ’জনেই কৃপণ! বাপ যে ওদের কত কোটা টাকার মালিক তা ওরাই জানে! ধনী বাপের ছেলে হয়ে ওরা পয়সা রোজগার করবে কি ক’রে বুঝছো না?” “হোঃ—হোঃ” করে হেসে উঠে সরোজবাবু বললেন,—“তাই বটে লতু, সত্যিই তাই!” তারপর তিনি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন ক’রে বললেন,—“হতভাগাটা বিলেতে গিয়ে একেবারে বানর হয়ে এসেছে! বসে খেলে

জীবন-সংগ্রাম

রাজার গোলাও যে শূন্য হয়ে যায় ! কটাই বা টাকার বড়লোক
তোদের বাপ ? বিপদ আছে, আপদ আছে, অসুখ আছে,
বিশুখ রয়েছে ! সামান্য যে কয়টা টাকা না খেয়ে, না বিলিয়ে
দিয়ে, জমিয়েছি,—তা কি আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো ?
তোরাই তো তা ভোগ দখল করবি । এটুকু বোঝবার বুদ্ধিও কি
ওদের হয় নি লতু ?”

—“সেই বুদ্ধিই যদি থাকবে ? তো বিলেত থেকে
কলকাতায় পৌঁছেই ও কি ক’রে হাসপাতাল খুলবার জন্ত
বাপের কাছে টাকা চেয়ে বসতে পারে ?”

সরোজবাবু লতিকার কথার উত্তর দিতে গিয়ে শুরু করলেন,
—“মাধুকে তুমি নিজে হাতে গড়ে তুলেছো তো ? মা বোলতে
যে মেয়ে একদিন অজ্ঞান হতো—তোমার এতটুকু অভাব
অসুবিধের কথা কানে গেলে যে বাড়ীর ঝি চাকরগুলোকে
গালমন্দ করতো ? অমন ঠাণ্ডা প্রকৃতির সেই মেয়ে
কি না—তোমারি মুখের ওপর বলে বোসলো বিলাস ছাড়া ও
আর কারু সঙ্গে বিয়ে বসবে না ! নিজে থেকে উপযাচক
হয়ে, ও গিয়ে জুঠলো বিলাসের সঙ্গে ! কি ছিল ছোকরার ?
না টাকা ; না বিষয় সম্পত্তি ! কোথাকার একটা হা ঘরের
ছেলে প্রাইভেট টিউটার, সেই হয়ে উঠলো.....—তোমার
অমন পছন্দ করা রূপচাঁদ বাবুর বিলেত ফেরৎ আই-সি-এস
ছেলের..... ?” বলেই তিনি লতিকার মুখের দিকে চেয়ে
সহসা থেমে পড়লেন ।

জীবন-সংগ্রাম

লতিকা দেবী কাপড়ের আঁচল দিয়ে ভাল করে চোখ দু'টো রগড়ে নিয়ে বললেন,—“আমাদের অদেহুই খারাপ ! নইলে আর কার এমন হয় ? দু'টো ছেলে মেয়ের জন্ম আমরা যা করেছি এ যুগে তার তুলনা হয় না ! কিন্তু অভাগা অভাগীরা তা বুঝলে না !” তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে তিনি বললেন—“বুঝতে একদিন হবেই ওদের ! তবে ততদিনে আমরা হয়তো...”

বিশুদ্ধ মুখে—দূরের দিকে চেয়ে সরোজ বাবু বললেন,—“মবেও আমাদের শাস্তি নেই লতিকা ! মবেও আমরা শাস্তি পাবো না !” মেঝের দিকে চেয়ে সরোজ বাবু অনেকক্ষণ ভাবলেন,—তারপর বললেন,—“মাঝে মাঝে মনে হয়—চাটী, বাটী, খুদ কুড়া যা আছে কোনও একটা অনাথ আশ্রমকে বিলিয়ে দিয়ে, দু'জনে মিলে তীর্থে তীর্থে ঘুরে জীবনটা কাটীয়ে দি । কিন্তু তাতেও মন তো ঠিক সাড়া দিচ্ছে না লতু ? কিসের যেন একটা স্মীণ আশা—যেন কিসের একটা আকাঙ্ক্ষা, কোথায় যেন আমাকে ছুটয়ে নিয়ে চলেছে !” তারপর একটা নিশ্বাস মোচন করে সরোজ বাবু বললেন,—“বোলতে পারো লতু ? কেন মানুষ সন্তানের জন্ম এমন কান্দাল হয় ? কিসের এই অন্ধ আকাঙ্ক্ষা মানুষকে উদ্ধার মতো ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় ? আজ আমার কেবল মনে হচ্ছে কি জানো ? সারা জীবন শুধু আমরা একটা ভুলের বোঝা বয়ে বেড়িয়েছি । আর হয়তো সেই উদ্দেশ্যহীন ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে মর'ছ জীবনের

জীবন-সংগ্রাম

এই শেষ বেলায় ! কেনই বা জগতে এসেছিলাম আর কোথায় যে যেতে হবে এ কথাটা আমরা কোনদিনই ভাবিনি লতু ! অথচ আজ দিন যত কাটছে, তত কেবলি এই ভাবনাটা আমাকে যেন উত্থাপ্ত করে মারছে । এর পরিণতি কোথায় জানো ?”

অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে দূরের দিকে চেয়ে লতিকা উত্তর দেয়,—
—“পরিণতি ! হয়তো উভয়েই একদিন পাগল হয়ে যাবো, নয়তো লোকালয় ছেড়ে কোনও জায়গায় দুজনারি একদিন পালিয়ে যেতে হবে । এ ভাবে তো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না ।” এমনি সময়ে সরোজ বাবু রেডিওর সুইসটা ঘুরিয়ে ক্যালকাটা স্টেশন ধরলেন । রেডিওতে তখন গানের রেকর্ড বাজছিল—

“পাগলা মনটারে তুই বাধ ।

কেনরে তুই বেথা সেথা পদ্মস প্রাণে ফাদ...”

দশ

আশার নেশায় দিনকতক নানা জায়গায় কাজকর্মের জন্ত হাঁটাহাঁটি ছুঁটাছুঁটি করে হঠাৎ একদিন বিলাস ছরে পোড়লো। এবং বিলাসের সেই ছর একদিন বিকারে পরিণত হ'ল। এদিকে মুষ্কিলে পড়েছে সব চাইতে বেশী মিনা তার মাধবী বৌদিকে নিয়ে ! উদাসিনীর মতো কবে থেকে সেই-কি যে এক রকমভাবে দিন কাটাচ্ছে মাধবী,—তা সে কিছুতেই বুঝতে পারে না ! সময় ম'ত স্নানাহার ভুলেছে সে আজ বহুদিন ধরে, দস্তুর ম'ত ঝগড়া করে তবে মিনাকে আজ মাধবীর মুখে অন্ন তুলে দিতে হয় ! অত্যন্ত রেগে গিয়ে মিনা এক একদিন বলে,—রোগ যেন আর কারো হয় না পৃথিবীতে ! ছরের ঘোরে আবোল তাবোল সে অনেকেই ব'কে থাকে, তাতে হয়েছে কি ? তেমন বেশী কিছু হ'লে দাদাকে বলে বিলাসদাকে সরোজ সেবা সদনে ভক্তি করিয়ে দিয়ে সারিয়ে তুলবে সে । এমনি এক একটা সান্ত্বনার কথা বলে বলে মিনা মাধবীর মনের দুশ্চিন্তাগুলো ঝেঁটিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করে । তারপর কোনদিন নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে হারমনিয়মের ডালাটা খুলে দিয়ে বলে,—বিলাস দা'র মাথার পাশের টেবিলে বসে অরুণ ড্রইং শিখছে । বিলাস দা এখন বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে । এইবার আপনি বসুন দিকি এইখানে স্থির হয়ে । তারপর হারমনিয়মের ষ্টপ গুলো খুলে দেয় ।

জীবন-সংগ্রাম

সেদিন বিলাসের রোগের বাড়াবাড়িটা যেন অনেক কম ছিল। অরুণ ও পাশের ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল। বাড়ীতে প্রায় কেউই ছিল না। বেলা তখন গোটা চারেকের মতো হবে। মিনা এসে মাধবীকে টেনে নিয়ে গেল ওপাশের ঘরে, হারমনিয়মে তার গান শোনবার জন্য।

স্নেহ-মৃগ্ন মাধবী দেবী কিছতেই—কে'ন যে'ন এড়াতে পারে না এই মিনাকে। হারমনিয়মে হাত দিয়ে সে বাজাতে শুরু করলো। মিনা বলে ও-সব রীড্ টেপাটিপিতে ভুলবো না! দস্তুর মত গান গাইতে হবে! বলেই সে হাসে। মাধবী উদাস নৃষ্টিতে দূরের দিকে চেয়ে গাইতে শুরু করে—

গান।

আমার এই চুঃখ নিশি
কভু কি পোহাবে নাকি?
কতকাল শুধু আমি
নীরবে রহিব জাগি!
ফোটে না দিনেরি আলো,—
এ যে নাহি লাগে ভালো;—
অচপল নিশীধিনী—

রেখেছে নয়ন ঢাকি!

আমার কুটীর পাশে, হেনা করে কানাকানি,
বনের পাপিয়া কাঁদে—ল'য়ে বেদনার বাণী,
বুকে লাগে ঢেউ তারি—
যত মুছি আঁধি বারি;
আলেঘারে চাহি মিছে
ভাবি আর নাহি বাকী।

জীবন-সংগ্রাম

গানটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিলাস সহসা ডেকে উঠলো,
—“অরুণ—” কিন্তু অরুণের পরিবর্তে সে কথার উত্তর দিলো ও
ঘর থেকে ছুটে এসে মাধবী, এবং এগিয়ে গিয়ে সে বললো—
“অরুণ ওপাশের ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। খাবে এখন কিছু ?”

সে কথার কো'ন উত্তর না দিয়ে বিলাস মাধবীর
হাতখানি তার নিজের বুকের কাছে টেনে নিতে নিতে বললো,
—“তোমাকেই খুজছিলুম মাধু—তোমাকেই শুধু! গান
গাচ্ছিলে তুমি? কি ছাই গান তোমার! এই দে'খ, তোমার
গান শুনে আমার বুকটা টিপ্ টিপ্ করছে!”

“গান শুনলে বুঝি বুকে বড্ড লাগে তোমার? তবে আর
আমি কোনদিন গান গাইব না!”

“তোমার গান আমার বুকে লাগবে! বোলছো কি তুমি?
ছুঃখের গান কেন গাও মাধু? প্রেমের গান গাইতে পার না?
তুমি গাও দেখি—

“কেবলি অঁাধি দিয়ে
অঁাধির সুখা পিয়ে,
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,
অঁাধারে নিশে যাক আর সব,—”

“—ওটা তো রবীন্দ্রনাথের ‘এমন দিনে তারে বলা যায়,’ একটা
কবিতার অংশ বিশেষ।”

—“হোলই বা কবিতা! ওটাও একটা গান। আর
রবীন্দ্রনাথের কোন্ কবিতাটাই বা প্রেমহীন ব'ল? তাজমহলের
পাথরের ভেতরে তো রয়েছে শুধু ঐশ্বৰ্যের গর্ভ। ওটা তৈরী

জীবন-সংগ্রাম

হয়েছিল অপ্রেমিকের হৃদয়ে প্রেমের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জ্ঞান! আর দেখ দেখি আমাদের কবির অনুভূতি! তিনি তাজমহল নিয়ে এমন কবিতা লিখলেন, যা প'ড়ে মানুষ মমতাজের চাইতে সাজাহানকেই অস্তুরে উপলব্ধি করলো বেণী! কিন্তু সে যাক! তুমি প্রেমের গান আমায় পারবে না শোনাতে আজ?"

—“কে'ন পারবো না গো?—আগে উঠে বসো, আমি খাবার নিয়ে আসি! খাওয়া শেষ হলেই আমি নিশ্চয় তোমাকে গান শোনাব!”

প্রচণ্ড ভাবে মাথা ছুলিয়ে বিলাস বলে উঠলো,—“না—না—না—মাধবী, খাবার নয়, খেতে চাইনা আমি, তোমার তাগিদে উদর আমার এতটুকুও উপবাসী হয়ে নেই! উপবাসী আমার মন! আমার সকল চিন্তা আজ বড় একা—বড় কাল্প মাধবী!—আমি শুধু আজ তোমাকেই চাই!” তারপর সহসা মাধবীর গলাটি এক হাতে জড়িয়ে ধরে বিলাস কানে কানে বললো,—“যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে,—সে কথা আজি যেন বলা যায়,—”

তারপর বিলাস চেষ্টা করে বলে উঠলো,—“সত্যি বলা যায় মাধু—সব বলা যায়! কবির ভাষাতেই আজ তাই বলতে সাধ হয় মাধবী,—

“জীবনের যত পূজা হলো না সারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা,
যে ফুল না ফুটিতে টুটল ধরণীতে—
যে নদ' মরু পথে হারালো ধারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।”

জীবন-সংগ্রাম

স্বামীর এই সমস্ত কথায় মাধবীর চক্ষে জল ভরে ওঠে। কেবলি তার মনে হয়—সংসারের অভাব অনটনের কথা চিন্তা করে করেই বিলাস আজ এমনি রোগ শয্যায় ভেঙ্গে পড়েছে। অথচ মাধবী তো অশিক্ষিত নয়! কে'ন তার পিতা মাতা তাকে উচ্চ শিক্ষা দিয়েছিল—? যদি দুদিনেই সে তার স্বামীর কোনো কাজে না লাগতে পারলো—তো কি প্রয়োজন ছিল তার এই শিক্ষার? বিলাস যদি বুঝতো, মাধবী অসময়ে সংসার চালিয়ে নেবার সামর্থ রাখে;—পড়তো কি বিলাস তা'হলে এমনি রোগ শয্যায় এলিয়ে? না-না—যে কোন মূল্য দিয়েই হোক মাধবী বিলাসকে সুস্থ করে তুলবে; নিজে রোজগার করে সে বিলাসকে মেটাল হাসপাতালে পাঠাবে! বিলাসকে না হলে মাধবীর এক দিনও চলবে না! যার জ্ঞান সে তার ধনশালী পিতার বিপুল ঐশ্বর্য সম্পদ পর্য্যন্ত উপেক্ষা করে আসতে পেরেছে। তাকে বাঁচিয়ে তুলতে, তাকে সুখী করতে মাধবী নিজের জীবন বিপন্ন করতেও রাজী। মাধবী আর চায় না যে বিলাস এমনি রোগ শয্যায় ছটফট করুক! এই সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে মাধবী বিলাসের রুক্ষ, শুষ্ক, চুল গুলোতে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। তারপর সে বললো—
“এইবার খাবার নিয়ে আসি?”

স্ত্রীর কথায় বিলাস সহসা বিছানায় উঠে বসে, মাথা নেড়ে বললো—“তোমাকে এখন আমি কিছুতেই ছাড়তে পারি না মাধবী!” তারপর সে সুর করে বলতে লাগলো,—

জীবন-সংগ্রাম

“—তুমি আমাকে আজ এমন একটা গান শোনাও মাধবী, যে গানে অন্তর ভরে ওঠে, রোগ যন্ত্রণার উপশম হয়। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়ি।” বলেই বিলাস তার উপাধানে, কনুইয়ের উপর মাথা রেখে মাধবী দেবার মুখের দিকে চেয়ে রইল। নাছোড়বান্দা স্বামীকে খুশী করতে বসে মাধবী তখন সুরু করলো,—

গান

তুমি নিশীথের আঁধিয়ারে
মোর দীপালী,
তারার প্রদীপ পথে
রেখেছ জ্বালি।

দূরের নদীর পারে—
খেয়া পাতি বারে বারে,
পার কর তুমি মোরে
একি হেঁয়ালি।

তুমি মোর নিরাশায়
আঁশার আলো,
গোপন হৃদয়ে প্রেম
প্রদীপ জ্বালো ;

আমার চলার সাথে
হাত দুটি দিয়ে হাতে
লয়ে চলো আরো দূরে
ওগো খেয়ালী ;

জীবন-সংগ্রাম

গানখানি শেষ হয়ে গেলে মাধবী চেয়ে দেখলো, স্বামী তার কখন যেন গান শুনতে শুনতে অঘোর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। তখন, ঘরে ডে-লাইট বাল্ব জ্বলে দিয়ে, সে দরজাটা ভেজিয়ে, ওপরে মিনার ঘরের দিকে আন্তে আন্তে অগ্রসর হ'ল। অরুণ ততক্ষণে এ ঘরে ঢুকে বাপের মাথার পাশের টেবিলে পড়বার জগু বই নিয়ে বসেছে।

এগারো

বাপের বাড়ীর মায়া কাটিয়ে নিজের বাড়ীতে এসে মিনতী এবার যেন একেবারেই বদলে গেছে। আর তাই দেখে সব চাইতে বেশী আশ্চর্য হলেন ধীরেনবাবু। এটা তবুও মন্দের ভালো, এইটুকু ভেবেই তিনি নিশ্চিত হলেন। স্বামীর সঙ্গে আলাপ আলোচনার পরিবর্তে আজকাল মিনার সঙ্গেই কথা বলতে মিনতী ভালবাসে বেশী।

মিনা প্রথমতঃ একটু বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু আজকাল মিনতীকে সে কোন ভাবেই আর এড়াতে পারে না। এক একবার তবুও মিনা তার বৌদিকে নানা রকমের কথা বলে ঠাট্টা

জীবন-সংগ্রাম

তামাসা করবার চেষ্টা কম করে না। কিন্তু মিনতীর সঙ্গে সত্যিই সে আর পাবে না। রাগাবার চেষ্টা করলে, যে মানুষ হেসে উড়িয়ে দেয়। অর্থের প্রলোভন এবং ঐশ্বর্যের গর্ব যার কাছে সহসা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের বস্তু হয়ে উঠেছে, তাকে আর মানুষ উপহাস করবে কি নিয়ে! মিনা মাঝে মাঝে আজকাল তাই অবাক হয়ে তার বৌদির মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

হাসপাতালে যাবার জন্ম ভোরবেলা সেদিন মিনা সেজে গুজে বেরুতে যাবে, এমনি সময়ে মিনতী তাকে বলে বোসলে:—
“কৈ ভাই ঠাকুরঝি তোমার হাসপাতালে তো আমাকে একদিনও নিয়ে গেলেন না? যাবে আজ আমাকে সঙ্গে নিয়ে?”

অপারিসীম বিষয়ে মিনা হেসে বলে—“হঠাৎ হাসপাতালে যাবার সখ হোল কেন’ বৌদি?”

তাচ্ছিল্যের সুরে মিনতী বলে,—অমনি! শুধু শুধু দিন-রাত বাসায় বসে কি আর ভাল লাগে?”

—“তা কোথাও বেড়াতেও তো যেতে পারো দাদাকে নিয়ে। হাসপাতালে গিয়ে দেখবে তো। শুধু নানা রকমের রোগী! তার কোন’টা পাগল, কোন’টা আধ পাগল! আর কোন’টা একেবারে বন্ধ পাগল।”

—“ঐ পাগল গুলোকেই তো আমার দেখতে সাধ হয়! চলই না আজ আমাকে নিয়ে।”

—“আচ্চা পাগল তো তুমি! আমি যাচ্ছি সেখানে আমার ক্লাস করতে। সময়ও আজ আর বেশী নেই! সেখানে তোমাকে

জীবন-সংগ্রাম

নিয়ে যাবো কি করে ? আমি থাকবো লেকচারের ঘরে !—
তুমি তখন থাকবে কোথায় শুনি ?”

—“আমি না হয় তোমার পাশেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
ডাক্তারের লেকচার শুনবো !”

—“সে হয় না ! ডাক্তার পাল রীতিমত বুড়ো মানুষ, তা
ছাড়া তিনি আজ মস্তিষ্ক সংক্রান্ত ব্যাপারে তথ্য পূর্ণ লেকচার
দেবেন।” বলে মিনা তার বাঁ হাতের ঘড়িটাতে নজর দিয়েই
বলে উঠলো,—“আর দাঁড়াবার সময় নেই বৌদি ! আমি চললুম,
অন্য একদিন তোমায় নিয়ে যাবো”—বলতে বলতে মিনা সিঁড়ি
দিয়ে গট্ গট্ করে নেমে গেল।

মিনা চলে যেতেই মিনতী গিয়ে মিনার পড়ার টেবিলের
পাশে একটা বই তুলে পাতা ওল্টাতে লাগলো। পাশের ঘরের
টেবিলে অন্তমনস্কের মত ছ'পা তুলে দিয়ে, দূরের দিকে দৃষ্টি
হারিয়ে কি যেন ভাবছিলেন ধীরেনবাবু ! পাশের কক্ষ নজর
পড়তেই, খোলা জানালার পথে চেয়ে দেখলেন মিনতী ! সহসা
মিনার পড়বার ঘরে, মিনতীকে দেখে তিনি যেন নিজের চক্ষুকে
বিশ্বাস করতে পারলেন না। চেয়ার ছেড়ে উঠে তখন আস্তে
আস্তে পাশের দরজা দিয়ে তিনি মিনার ঘরে ঢুকেই নিরাভরণা
মিনতীর দিকে আগাগোড়া লক্ষ করে বেয়াকুবের মত চেয়ে
রইলেন।

পেছন ফিরে, সেই অবস্থায় ধীরেনবাবুকে দেখেই মিনতী
বললো—“অমন করে চেয়ে রয়েছ কেন ? কি হোল তোমার ?”

জীবন-সংগ্রাম

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করে ধীরেন বাবু বললেন—
“কি যে হয়েছে তাতো তুমিই আমার চাইতে বেশী জানো!”
তারপর একটু হেসে বললেন—“গয়নাগুলো কি বাস্কে রেখেছ ?
না কোথাও বেচে দিয়েছ ?”

একটুখানি হেসেই মিনতী বললো—“বিলিয়ে দিয়েছি।”

—“বিলিয়ে দিয়েছ ? সোনার গয়না ? বলছো কি
তুমি ?”

বইয়ের পাতা ওপটাতে ওপটাতে মিনতী উত্তর দেয়—
“আমার বাবার একজন গরীব বন্ধুর মেয়ের বিয়ের জন্য দান
করেছি।” তারপর উপেক্ষার হাসি হেসে সে বলে—“কি হবে
গয়না দিয়ে ? বাস্কে তো আরো অনেক রয়েছে ! বেচতে চাও
নিয়ে বেচে দাও। ও আর আমি পরবো না !”

স্তুভিত বিষয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে,
ধীরেন বাবু বললেন—“তোমার কথা শুনে হাসবো কি কাঁদবো
ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।” তারপর একটু ভীত চিন্তিত সহানুভূতির
সুরে তিনি মিনতীকে প্রশ্ন করলেন—“গয়না বিলিয়ে দেবার
এই ব্যাপারটা কি তোমার প্রচ্ছন্ন বিলাস,—না বৈরাগ্যের
লক্ষণ ?” সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে মিনতী দেবী
মিনার কক্ষ থেকে অতি অকস্মাৎ বেরিয়ে চলে গেল। বিষয়ে
বিমূগ্ধ ধীরেন বাবু তখনও মিনার ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিনতীর
এই মানসিক ভাবান্তরের ব্যাপারটা মনে মনে উপলব্ধি করবার
চেষ্টা করতে লাগলেন।

বারে

হাসপাতালের বিরাট একটি কক্ষে ক্লাস বসেছে। মাঝখানে লম্বালম্বি ভাবে বিরাট একটা টেবিলের ওপর ডেড্‌ব'ডির কতগুলো মডেল এবং মাথার খুলি, পর পর শ্রেণী বদ্ধভাবে সাজানো রয়েছে! টেবিলটার দু'পাশেই সারিবদ্ধ ভাবে, ডাক্তার পালের লেকচার শোনবার আশায়—কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা দণ্ডায় মান। টেবিলের এক পাশের সারিতে ডাক্তার ঘোষ, ডাক্তার মৈত্র, ডাক্তার রায়, ডাক্তার ব্যানার্জি প্রভৃতির সঙ্গে আরও চার জন নবাগত ছাত্র অপেক্ষা করছিল। টেবিলের অপর দিকের সারিতে জন তিনেক ছাত্রীর সঙ্গে লেকচার শোনবার জ্ঞ ডাক্তার পালের দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল—সুচিত্রা, শেফালি আর মিনা।

খান কয়েক মোটা বইয়ের পাতা উন্টে পাণ্টে ডাক্তার পাল উঠে দাঁড়িয়ে সমবেত ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে বললেন। “আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীগণ যদিও বডি ডিসেক্‌স্ন সম্পর্কেই আজ আমার বিশেষ লেকচার দেবার কথা ছিল কিন্তু সেটাকে আমি আজ প্রয়োজন বোধেই বাদ দিয়ে তোমাদের কতগুলো নতুন কথা শোনাতে চাই। সরোজ সেবা সদনে জনসাধারণের মানসিক চিকিৎসাই বেশী হয়ে থাকে, কিন্তু এই চিকিৎসা যে ক'ত দূরূহ এবং কত দায়িত্বপূর্ণ তা জানতে হলে, প্রথমেই তোমাদের মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তোমরা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে ইতিপূর্বে লণ্ডনের একজন

জীবন-সংগ্রাম

সুবিখ্যাত ডাক্তার—মানুষের মস্তিষ্ক থেকে রশ্মি সমূহ বিকিরণের এক অপূর্ব তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তিনি প্রথমেই বলেছেন ; মস্তিষ্ক বিকিরণের পরিমাপ নিতে গিয়ে, আমরা দেখেছি মানুষের মন ; মনস্তত্ত্বের পরীক্ষার চাইতেও সঠিক এবং পরিষ্কার ভাবে, মানুষের মনের আলো অথবা অন্ধকার, দুর্বলতা এবং শক্তি, ভয় অথবা সাহস,—সঙ্কীর্ণতা কিম্বা উদারতা এতে খুব সহজে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে ধরে দিতে পারে। যা থেকে মানুষের জীবনের অজানা রহস্য,—যেমন তার ইচ্ছা, অনিচ্ছা, তার ধীশক্তি তার মানসিক শক্তি সমস্তই তার মস্তিষ্কের বিকিরণের পরিমাপ থেকেই সচ্ছন্দে আবিষ্কার করে ফেলা যেতে পারে।

কমবেশী কতকগুলি মানসিক শক্তি নিয়ে প্রত্যেক মানুষই এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু যদি পৃথিবীর সমস্ত মানুষই খুব মানসিক শক্তি সম্পন্ন হতো, তা হলে কিন্তু অনেক প্রয়োজনীয় কাজের জন্মও আমরা সুনিপুণ বা অনিপুণ শ্রমিক পেতাম না। আমাদের বালক বালিকাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতরে এটা খুবই লক্ষ রাখা উচিত যাতে, তারা তাদের জন্মগত যোগ্যতাকে সুগঠিত করে তুলতে পারে। কিন্তু যদি আমরা তাদের যোগ্যতার অনেক উর্দে, বা অনেক নিম্নে, জোর করে তাদের পরিচালিত করবার চেষ্টা করি, তা হলে কিন্তু তারা বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। একজন স্ত্রী বা পুরুষের মানসিক ক্ষমতা সমান। কিন্তু বালক বালিকাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং

জীবন-সংগ্রাম

তাদের প্রতি সাধারণের মনোভাব, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের মানসিক শক্তিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। কখনো বা তাদেরকে আবেগ জনিত সমস্যার সম্মুখীন করে দেয় ; এবং তারি ফলে বালক বালিকাদের মানসিক ক্ষমতা বিভ্রান্ত হয়। এই বিভ্রান্তির পরিণাম প্রায় ক্ষেত্রেই মারাত্মক হয়ে ওঠে। একমাত্র Proper Treatment ছাড়া, মস্তিষ্কের রশ্মি বিকিরণের বায়োমেট্রিক পাওয়ারের তারতম্য অনুসারে রোগীর মানসিক যোগ্যতার দিকে লক্ষ রেখে,—প্রাকৃতিক চিকিৎসার ভেতর দিয়ে যদি বা রোগীকে সারিয়ে তোলা সম্ভব, কিন্তু তাই বলে ইন্জেকশনের দ্বারা তার অযোগ্য মস্তিষ্ক গ্রন্থির উন্নতি সাধন করা কোনদিক থেকেই সম্ভব নয়। তা যদি হোত, তা হলে ইন্জেকশনের দ্বারা শুধু যে মানুষের মস্তিষ্কেরই উন্নতি সাধন করা সম্ভব হোত তাই নয়, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেও প্রতিভাবান করে তোলা, সেই ইন্জেকশনের সাহায্যেই সম্ভব হোতো।

ডাক্তার বলেছেন ; মস্তিষ্কের বিকিরণের ভিত্তিতে পরীক্ষা করতে গিয়ে, আমরা দেখি ইউরোপের শতকরা ৮০ জন মানুষের মস্তিষ্কে, ২২৫ থেকে ২৩০ বায়োমেট্রিক রশ্মি বিকিরিত হয়। এবং সেটা হচ্ছে দৃশ্যমান আলট্রাভায়োলেট—রশ্মির তরঙ্গায়তি। এই পর্যায়ে ফেলা চলে সাধারণ কর্মী, ডাকপিয়ন, তন্তুবায়, যন্ত্রশিল্পী, ছোট দোকানদার, কেরানি, এবং টাইপিষ্ট প্রভৃতিকে। কিন্তু যখন এই বায়োমেট্রিক রশ্মি, মানুষের ২৪০ বায়োমেট্রিকে দেখা দেয়, তখনই তার জ্ঞান ও ভাবের সদৃশ্যাবলী কার্যে

জীবন-সংগ্রাম

রূপান্তরিত হ'তে শুরু করে। এই বায়োমেট্রিক রশ্মি যখন ২৪০ থেকে ৩০০ ডিগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন আমাদের প্রধান শক্তি ও উৎসাহ, স্থূল জগতের কার্যকারীতাতে সীমাবদ্ধ থাকে। সহস্রাধিক ব্যক্তির মস্তিষ্কের রশ্মি গবেষণা থেকে এটা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হয়েছে—যে, মস্তিষ্ক বিকিরণের পরিমাপ ৩০০র কম হ'লে, কোনো ছেলেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা উচিত নয়; কারণ সেখানে তারা অনুপযুক্ত প্রতাপন হবে। অধিক বিকিরণ শক্তি সম্পন্ন, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মানসিক শক্তির সঙ্গে, প্রতিযোগিতা মূলক সংগ্রামে, যখন এই সব, কম বিকিরণ শক্তি সম্পন্ন ছেলেরা আর পেরে ওঠে না, তখনই তারা অসংপত্তনের ধাপে নেমে আসে। ফলে আমরা দেখতে পাই, ছেলেকে অত্যধিক ভালো তৈরী করতে গিয়ে তারা এক একটা শয়তান ও বদমাইস হয়ে উঠেছে। অথচ এটা যে তাদের সীমাবদ্ধ শক্তির প্রভাবেই সংঘটিত হয়ে থাকে, সেটা আমরা তখন ভুলে যাই। ৩১০ থেকে ৩৭০ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বর্গের মধ্যে বেশ সহজ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে আমরা দেখতে পাই। ৩৭০ থেকে ৩৯৫ ডিগ্রী বায়োমেট্রিকের মধ্যে, গোঁড়াভাব সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সন্ধান পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর লোকেরা পুস্তকে ছাপার হরফে না দেখা পর্যন্ত নূতন কোন কিছু-রি অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ৪০০ ডিগ্রীর ওপরে আমরা মুক্ত মনের মানুষদের সন্ধান পাই। এই পর্যায়ের ব্যক্তির গোঁড়ামীর পরিবর্তে নিজের যুক্তি এবং বুদ্ধির ওপরেই

জীবন-সংগ্রাম

নির্ভর করেন বেশী। বিখ্যাত ব্যারিস্টার, ঔপন্যাসিক, রাজনীতিক, শাসনকর্তা, বড় বড় ব্যবসায়ী, অর্থনীতিবিদ, সৈন্যবিভাগের কর্তা, বড় বড় ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক এবং সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে আমরা এই শ্রেণীতে পাই। বড় বড় চিত্র তারকা এবং বিখ্যাত অভিনেতাদের, ৫১২ ডিগ্রী থেকে ৫৩০ ডিগ্রীর ভেতরে দেখা যায়।

সব চাইতে রহস্যজনক হচ্ছে মানুষের মন। মনস্তত্ত্ব মানুষের মন ও হাবভাব বোঝবার পক্ষে সহায়ক। কিন্তু এতে মনস্তত্ত্ব খুব কম আলোই প্রদান করে থাকে।

মস্তক থেকে মস্তিষ্ক বিকিরণের পরিমাপ ছাড়াও, কোনও ব্যক্তির হস্তাক্ষর, কিম্বা নাম সহি, অথবা তার হাতের আঁকা কোনও বস্তু থেকেও তার পরিমাপ পাওয়া যায়। মস্তিষ্কের বিকিরণের পরিমাপ, মানুষের বর্তমান অথবা একশত বৎসর পূর্বের হস্তাক্ষরের বিকিরণের পরিমাপের সঙ্গে সমান। অতএব মানুষের মৃত্যুর পরও যে তার মস্তিষ্ক বিকিরণের পরিমাপ নির্ধারণ করা সম্ভব, এটাও স্বচ্ছন্দে প্রমাণিত হয়েছে।

আজ আমি খুব সংক্ষেপে মস্তিষ্ক বিকিরণ সম্পর্কে তোমাদের একটু আভাস দিয়ে রাখলুম। বিদেশ থেকে রশ্মি পরীক্ষার যন্ত্রপাতিগুলো খুব শীগগিরই এখানে এসে পড়বে, এবং সেই সঙ্গে রেডিয়াম-রশ্মি এবং রঞ্জন-রশ্মি সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ যন্ত্রপাতিগুলোও আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেগুলো সব এসে পড়লে, আমি বিষদ ভাবে এ বিষয়ে তোমাদের অনেক কিছুই শেখাতে পারবো!

জীবন-সংগ্রাম

আমি জানি, তোমরা অনেকেই হাসপাতালের ডিউটিতে অধিকাংশ সময় নিযুক্ত থাকো। এ হাসপাতালে মানসিক রোগগ্রস্থ রোগীর অভাব নেই। কিন্তু তাদের আচার ব্যবহার দেখে শুনে, তোমরা যদি তাদের রোগটা, হাসিঠাট্টা করে উপেক্ষা করো,—অথবা তাদের ভয় করে দূরে দূরে সরে থাকো, তাহলে কিন্তু তোমাদের অনুসন্ধিৎসা অক্ষুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। মানসিক বিকার গ্রস্থ রোগী, সে যেমনই হোক ; অথবা তার রোগ যত উৎকর্ষিত হোক না কেন,—তোমরা তার প্রতিটি হাব-ভাব এবং গতিবিধি অত্যন্ত গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করবার চেষ্টা করবে। বারাস্তুরে এই সব রোগী সম্বন্ধে তোমরা যত বেশী আমাকে প্রশ্ন করবে, তত বেশী আমি তোমাদের ভেতর থেকে, শ্রেষ্ঠ ছাত্রছাত্রী বেছে নিয়ে, তাদের উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে আরো মনোযোগী হ'তে পারবো।

সেবার চাইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম এ সংসারে আর কিছুই নেই। অজানা, অসহায় মানুষের রোগ মুক্তির সেবাই হচ্ছে ডাক্তারী জীবনের প্রধান এবং প্রথম শিক্ষনীয় বিষয়। কাজেই তোমরা যারা সত্যিই লোক সেবার প্রবৃত্তি নিয়ে ডাক্তারী পড়তে অগ্রসর হয়েছে, তাদেরকে একাগ্রচিত্ত এবং সেবা পরায়ণ হতেই হবে। আর যাদের তাতে আপত্তি রয়েছে, তারা এখন থেকেই বিভিন্ন শিক্ষার—বিভিন্ন পথ ধরে, কাজে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করো ; নইলে শেষ পর্যন্ত দু'কূলই নষ্ট হয়ে যাবে। আজকের মত আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ।”

জীবন-সংগ্রাম

হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেই মিনা সেদিন মাধবীকে বললো—“আর তোমায় ভাবতে হবে না বউদি, দাদার জগ্ন সরোজ সেবা সদনে বেডের ব্যবস্থা করে এসেছি। আজ বিকেলেই দাদাকে ভর্তি করে দেবো।”

ভেরো

হাসপাতালের বিরাট কক্ষের মাঝখান দিয়ে সরু পথ। ছুধার দিয়ে রোগীদের সারি সারি শয্যায় নানা রকমের রোগী শুয়ে রয়েছে। কেউ বা বিড়বিড় করছে, কেউ বা হাত মুখ নাড়ছে, কেউ বা মুখে নানা রকমের কথা উচ্চারণ করে হাসছে। কেউ বা মাঝে মাঝে উন্মাদের মত চেষ্টায়ে উঠছে। কেউ বা বসে বসে কাঁদছে।

এই হল-ঘরটার ছ'পাশে, ছ'খানা টেবিলের পাশে মাত্র ছ'খানা করে চেয়ার সাজান ছিল। মোট চারটি নার্স ঐ চেয়ার টেবিল গুলোতে, এক একবার রোগীদের তদ্বির তদারক করে, ফিরে ফিরে এসে বসছিল। আগাগোড়া সাদা নার্সের পোষাকে মিনা এই কক্ষটিতে ঘুরে ঘুরে, এক একজন রোগীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে—তাদের, কিসের, কোথায়, অশুবিধে হচ্ছে, তাই জিজ্ঞেস করে বেড়াচ্ছিল। হাসপাতালের এই কক্ষটিতে বিশেষ ভাবে মানসিক রোগগ্রস্ত রোগীদের বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জীবন-সংগ্রাম

—“শুনছো মা ঠাকরুণ ?” একজন রোগী হাত ইসারায় মিনাকে ডেকে বললো। মিনা তার দিকে ফিরে চাইতেই রোগীটি তখন বিছানায় উঠে বসে, হাত মুখ নেড়ে, মিনার দিকে চেয়ে বোলতে শুরু করলো—“বলি তোমাদের আক্কেল খানা কি বোলতে পারো ? হারানো মেয়েটা, আমার কাছে রোজ আসতে চাচ্ছে ; আর রোজ রোজ তোমরা তাকে গেটে বাধা দিচ্ছ কেন ?” তারপর উদ্বেজিত হয়ে সে বলে উঠলো “আমি শুনতে চাই তোমরা তাকে আমার কাছে আসতে দেবে কি না ? my only daughter, তা জানো ?”

কথা শুনে, স্থিত হাস্যে মিনা সেই প্রোঢ় রোগীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো,—“তুমি ভুল কোরছো বাবা ? আমিই তো তোমার সেই মেয়ে ! চিনতে পারছ না ?”

প্রোঢ় রোগীটি তখন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলতে শুরু করলো,—“তুমিই যদি সেই—তবে ডাক্তারগীর পোষাক পরেছ কে'ন ? কলসী কাঁখে ঘাট থেকে কৈ জল তো আনতে দেখিনি ? ভেটকী মাছের ঝোল খাধতে জানো ? কোথায় তোমার সেই জর্জেট শাড়ী খানা ?—আমি পূজোতে যেটা দিয়েছিলুম ?” তারপর বিড়বিড় করে সে বকতে শুরু করলো,—“সে চেহারা নয়, সে কথাবার্তা নয়, সে রকম শাস্ত্র শিষ্ট নয় ; বাবা বলতে অজ্ঞান ছিল !—কামিনী মা আমার, বাবা বোলতে অজ্ঞান হোত ! ঞাকামী করে আমার কাছে কামিনী সাজতে এসেছ ?” বলেই লোকটা হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে,

জীবন-সংগ্রাম

বিছানার বালিশে মুখগুজে, শুয়ে শুয়ে ফোঁপাতে লাগলো। রোগীটি নূতন ভর্তি হয়েছিল। একজন নাস' তার এমনি ব্যবহার দেখে, মিনার কাছে এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা জানতে চাইলো। সেই রোগীটির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে, মিনা তখন নাস'টিকে অতি আন্তে জানালো, কণ্ঠা সম্ভান ছিল এই ভদ্রলোকের মাত্র একটি। এবং সেই মেয়েটিকে ইনি প্রাণাধীক ভালবাসতেন। মেম-টিচার রেখে মেয়েটিকে ভালভাবে লেখাপড়া গান বাজনা শিখিয়ে ছিলেন ইনি। হঠাৎ একদিন বিশুচিকা রোগের আক্রমণে, মাত্র ৪৮ ঘণ্টা রোগ ভোগ করে মেয়েটি মারা যায়। তারপর থেকেই ভদ্রলোকের মাথা ধারাপ হয়েছে। এঁর পয়সা, কড়ি, বাড়ী, গাড়ী, পুত্র, পরিবার ইত্যাদি, আর কিছুরই অভাব নেই, কিন্তু মেয়ের মৃত্যুর পর থেকেই এঁর এই অবস্থা!”

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করে নাস'টি ধীরে ধীরে মিনার কাছ থেকে সরে গেল।

অদূরের একটি শয্যার পাশে গিয়ে একজন নাস', একটি মানসিক বিকারগ্রস্থ রোগীকে খাবার দিচ্ছিল। মাথার পাশের টেবিলে খাবারটা নামিয়ে রাখতেই, যুবক ছেলেটি ছুঁহাতে নাস'টির ডান হাত খানা জড়িয়ে ধরে বললো,—
“অবিকল তোমার মতন!” তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে চেয়ে সে তারপর বোলতে শুরু করলো,—“না—না, ভুল হবার যো নেই! সেই নাক, সেই মুখ, সেই চক্ষু ছুটি।

জীবন-সংগ্রাম

হতভাগারা আমায় বিয়ে করতে দিলে না।” তারপর নাসের হাতটি সহসা ছেড়ে দিয়ে সেই যুবক, তার বালিশের ওপর একটা প্রচণ্ড ঘুঁষি মেরে বোলতে শুরু করলো,—“আমি এর শোধ নোবই কিছুতেই ক্ষমা কোরবো না। এ সংসারে ক্ষমা নেই! চাণক্যই বলেছিল বোধহয়! হৃদয়ের যে যন্ত্রণা ভেতরে টগবগু করে ফুটে ফুটে, আমাকে দন্ধে দন্ধে মারছে; দু’টা মিষ্টি কথা, দু’ফোঁটা সখের চোখের জল সেখানে তুচ্ছ!” তারপর অত্যন্ত উদ্বেজিত হয়ে, বিকৃত কণ্ঠে যুবক বলে উঠলো,—“আমি খুন কোরবো। শশীকান্তকে আমি খুন কোরবো! তার মাথা দিয়ে আমি ফুটবল...” পর্যন্ত বলা শেষ হতে না হতেই, সেখানে দু’জন নাস, বিষ্টু ডাক্তার এবং মিনাকে হাজির হ’তে দেখে, যুবকটা বিছানায় এলিয়ে পড়লো।

বিষ্টু ডাক্তার বললো,—“এঁকে তেইশ নম্বর রুমে Transfer করে দিন। এখানে থাকলে অগ্ন্যাগ্নি রোগীরা ভয় পাবে!”

মিনা বিষ্টু ডাক্তারকে প্রশ্ন করলো,—“কি হয়েছে ওঁর?” একটু মুচকি হেসে, বিষ্টু ডাক্তার অপর রোগীর বিছানার দিকে যেতে যেতে ফিরে চেয়ে, মিনার কথার উত্তরে বললো! “প্রেমে পড়েছিল, কিন্তু বিয়ে হয় নি। আর কিছু নয়!” ডাক্তারের কথা শুনে মিনা সহসা লজ্জায় যেন রাঙা হয়ে উঠলো। তারপর মাথা নীচু করে সে বিপরীত দিকে চলে গেল।

জীবন-সংগ্রাম

বিলাসের পাশের সিটের একটি রোগীর বন্ধ পরীক্ষা করে
বিষ্টু ডাক্তার, টেথিস্কোপটা কোটের পকেটে পুরতে পুরতে
বিলাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাকে আসতে দেখেই বিলাস
শুরু করলো—

“—অসহায় জাতি মরিছে ডুবিল! জানে না সম্ভরণ”

ডাক্তার তুমি বাঁচাইবে পারে? বল তো করিয়া পণ?

গম্ভীরভাবে ডাক্তার বলে উঠলো,—“দেখি একবার বুকটা?”
হাত ছ’খানা উঁচু করে বিলাস বোলতে শুরু করলো,—“বুক
দেখে কি করবে ডাক্তার? ও তোমার টেথিস্কোপ আর
থারমোমিটারে হবে না! থাণ্ডার চাই ডাক্তার, থাণ্ডার চাই—
বুঝলে? অর্থাৎ—

“যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধনিবে না,

অত্যাচারীর খড়্গ কুপাণ ভীম রণ ভূমে রনিবে না—

বিদ্রোহী রণ রাস্তা—

আমি সেই দিন হ’ব শান্ত!”

ডাক্তারের বুক পরীক্ষা শেষ হলে বিলাস বললো—“কি
দেখলে ডাক্তার?—

“আমি বন্ধন হারা কুমারীর বেনী, তব্বী নয়নে বহ্নি,

আমি ষোড়শীর হৃদি সরসিঙ্গ প্রেম, উদ্দাম, আমি ধন্য।”

জীবন-সংগ্রাম

কিন্তু আমার মাধবী কোথায় ডাক্তার ? তুমি আমাকে আমার স্ত্রী পুত্র থেকেও বঞ্চিত করেছ ! যে দিন মুক্তি পাবো সেদিন তোমায় কি করবো জানো ডাক্তার ?—আমি তোমায় বধ কোরবো ! ‘তুমি আমাকে সম্রাট করেছ ! তুমি আমায় নরকে নিক্ষেপ করে আবার স্বর্গে উঠিয়েছ ! আমি তোমায় বধ ক’রে, তোমার মূর্ত্তি গড়িয়ে পূজো কোরবো ! না-না, এ কি ! এ আনন্দ না-হুঃখ্য ? এ যে—এ-যে না,—একটা কিছু করতে হবে, যাতে বুঝতে পারি, যে আমি বেঁচে আছি—হাঃ—হাঃ—হাঃ !’ কেমন অবিকল চাণক্যের মত বলতে পেরেছি কি না ? বলো ডাক্তার তুমিই বলো—? অবিকল আমি চাণক্যের ম’ত তোমায় বলতে পেরেছি কি-না ?”

বিষ্টু ডাক্তার একটু মুচকি হেসে বললো,—“হ্যাঁ অবিকল চাণক্যের মতই বলেছেন ! এবার শুয়ে পড়ুন ! পরে আসবো !” বোলতে বোলতে ডাক্তার চলে গেল । বিলাস তার গমন পথের দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে শেষে বিছানায় বসে পড়লো !

কাজ শেষ করে বিষ্টু ডাক্তার একটা লম্বা প্যাসেঞ্জ পেরিয়ে নিজের অফিস কক্ষের দিকে অগ্রসর হ’তে যাবে, এমনি সময়ে প্যাসেঞ্জের পাশের গাড়ীবারান্দায় দাঁড়িয়ে, একজন রোগী অশ্রুমনস্ক ভাবে, হাতের দোতারা-টা বাজাতে বাজাতে গেয়ে উঠলো :—

জীবন-সংগ্রাম

গান

বন্ধু, মনের কথা কইব কারে

তুমি নাই আমার ।

তাইতো আমার পরাণ কেঁদে—

ফেরে সাগর পার ॥

(বন্ধু তুমি নাই আমার)

আঙ্গিনায় মোর বকুল ঝরে

শিউলি ভেজে শিশির নীরে,

মলয় বহে, কোকিল ডাকে ;—

ফাগুন-অভিসার ॥

(বন্ধু তুমি নাই আমার)

লতা জড়ায় তরুর দেহ

গভীর প্রেম ডোরে,—

(ওগো) তুমিও এমনি ছিলে

আমায় বুকে ক'রে ;

মনে কি পড়ে না কভু ?—

তোমায় ভেবে আঙ্গিওঁতবু,

নীল যমুনার তীরে যে ফিরি

কতই বারে বার ।

(বন্ধু তুমি নাই আমার)

গানখানি শেষ হবার সময় মিনা একজন নাসের সঙ্গে

কথা বলতে বলতে, সেই প্যাসেজটির মুখে থেমে দাঁড়ালো ।

নাসটি মিনাকে প্রশ্ন করলো—“এর তো কোনও মস্তিষ্কের

জীবন-সংগ্রাম

দোষ রয়েছে বলে মনে হয় না ? একে তবে এখানে এনে রাখা হয়েছে কেন ?” মিনা উত্তর দেয়,—“একটি মেয়ের প্রেমে প’ড়ে, এই লোকটি যৌবনে তাকে নিয়ে দেশান্তরি হয়েছিল। কিন্তু অর্থাভাবে, আর সাংসারিক অভাব অনটনের তাড়নায়, শেষ পর্যন্ত সেই মেয়েটি,—এই লোকটির সঙ্গ ছেড়ে কোথায় যেন চ’লে যায়। সেই থেকে এই লোকটি না খেয়ে,—না ঘুমিয়ে, অনবরত তার সন্ধান করতে করতে, একদিন একটা রাস্তার দেয়াল পঞ্জিতে সেই মেয়েটির চেহারা এবং নাম দেখতে পেয়ে, পাগল হয়ে যায়। তারপর থেকে, মেয়ে মানুষ দেখলেই তাকে তেড়ে মারতে যেতো। পারার লোকে ওঁর এই সব উৎপাত সহ্য করতে না পেরে, ওঁকে এইখানে স্থানান্তরিত করেছে। আর ঐ গান গাওয়াটা হচ্ছে ভদ্রলোকের অনেকটা স্বাভাবিক মনের অবস্থা। উনি এখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছেন। সঙ্গীত বিদ্যাটা বোধ করি ওঁর স্বভাবগত বস্তু। উনি কোনকালে যে একজন ভাল গায়ক ছিলেন, তা ওঁর আজ-কালকার গান শুনে আমরা বুঝতে পারি।”

দোতারা হাতে লোকটির দিকে, অঙ্গুলি নির্দেশ করে নাম’টি বলে উঠলো,—“ওমা ! ঐ দেখুন দিদি কেমন কটমট করে তাকাচ্ছে লোকটা আমার দিকে। কী সর্বনাশ ! ঐ দেখুন—এই দিকেই আসছে যে !” নামের কথা শুনে মিনা একবার পেছন ফিরে দেখেই বললো,—“ভয় পাবেন না ধীরে ধীরে চ’লে আসুন।”

চোদ্দ

রাত্রি ১০টার পর সেদিন হাসপাতালে নিজের চেয়ারে বসে বিষ্টু ডাক্তার তার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের গত দেড় বৎসরের কথা রোমন্থন করে, মনে মনে তৃপ্তি অনুভব করছিল। এমনি সময়ে শেফালি তার চেয়ারে প্রবেশ করলো। গলায় তার একটা টেথিস্কোপ ঝুলছিল। আঁটসাঁট দেহের গড়ন। পরনে একখানা পরিষ্কার চওড়া কালো পেড়ে শাড়ী। শাড়ীর আঁচলে তার কোমর বেশ শক্ত করে জড়ানো। গায়ের সাদা ব্লাউজটিতেও তাকে সুন্দর মানিয়েছিল। হাতে দু'গাছা করে সরু চুড়ি আর কানে ছিল সাধারণ দুটি টব। পায়ে একজোড়া সাধারণ স্ট্রাণ্ডেল।

চেয়ারে ঢুকেই শেফালি ডাক্তারের সম্মুখে চেয়ারে উপবেশন করলো।

ডাক্তার প্রশ্ন করলো—“এত রাত্রে হঠাৎ কি মনে করে এলেন ? ডিউটি দিচ্ছেন বুঝি কো'ন ওয়ার্ডে ? কিছু প্রয়োজন আছে আমাকে এক্ষুনি ?”

বিষ্টু ডাক্তারের উৎফুল্ল মুখের দিকে চেয়ে, শেফালি হাসতে হাসতে বলে,—“আমি শুধু শুনতে এসেছি, আপনার ছ'নম্বর ওয়ার্ডের আঠারো নম্বোর বেডে, যে রোগীটিকে আজ ভর্তি করা হয়েছে, ওঁর উত্তেজনা তো ক্রমেই বাড়ছে দেখতে পাচ্ছি। ওঁকে কি মরফিয়া ইনজেকশন্ দেবো ? আশ-পাশের

জীবন-সংগ্রাম

রোগীরা তো ঘুমুতেই পারছে না ওঁর হৈ-ছল্লোড়ে।” সহসা চিস্তিত ভাবে ডাক্তার বললো—,“ওঁর জন্ম আপনাকে ভাবতে হবে না। ডক্টর ঘোষ এবং মৈত্র, দু’জনেই আজ পর পর চারটে ওয়ার্ডের রোগীদের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। প্রয়োজন হলে তাঁদের কাউকে ডেকে বোলবেন, ওঁরাই তার ব্যবস্থা করবেন।” তারপর, আকস্মিক উৎসাহিতের মতো, একটু আলাপ করার ভঙ্গিতে, বিষ্টু ডাক্তার শেফালিকে প্রশ্ন করলো—“কেমন লাগছে আপনার এই সব হাসপাতালের কাজকর্ম?”

“—দিনের বেলায় বেশ ভালই লাগে। রাত্তিরের দিকে ডিউটা দিতে একটু ভয় ভয় করে”,—বলে শেফালি একটু হাসলো।

শেফালির মুখের দিকে চেয়ে, হৃদু হেসে, ডাক্তার বলে,—
“অসহায় রোগীদের রোগ যন্ত্রণা দেখে তো ছঃখ্যুই হবার কথা। তাতে তো ভয় পাবার কথা নয়। ‘ভয়’ একটা বিক্রী রোগ।”

সলজ্জ হাসি মুখে, ডাক্তারের কথার একটা যুক্তযুক্ত উত্তর দেবার কথাই হয়তো শেফালি ভাবছিল; এমন সময়ে হস্তদস্ত হয়ে, ঝাড়া বক্ষে প্রবেশ করেই বলে উঠলো—“বিষ্টু, ডা, টোমার ঐ টিন নম্বোর রোগী-টা আমাকে টিষ্টোতে ডিচ্ছে না! দেখলেই শুটু ছকুম করবে! মিনাডিটা কখন সেই রাত্তির ডিউটীতে আসবে, আমি টটোক্ষণ কিছুটেই ঐ রোগীটার পাশে ঠাকুতে পারবো না। টুমি অন্ত ব্যবস্থা ডেকো।”

ঝাড়ার কথা শুনে, শেফালির মুখের দিকে চেয়ে, ডাক্তার প্রশ্ন করলো,—“তিন নম্বোর বেডে কে রয়েছেন বলুন তো?”

জীবন-সংগ্রাম

“Mr B. Roy. ধীরেন বাবুর বাড়ীর সেই ভাড়াটে ভদ্রলোক।” তারপর, ছাড়ার দিকে চেয়ে শেফালি বলে উঠলো—“তিনি তো কাউকে বিরক্ত করেন না?”

ভীতিবিহ্বল নেত্রে, শেফালি আর বিষ্টু ডাক্তারের দিকে চেয়ে, ছাড়া বলে,—“বিরক্ত্ আবার করে না! কোটা ঠেকে কটক্-গুলো—অঙ্কের হরফ্ নিয়ে এলো পর পর সাজিয়ে। আমায় বলে কি না ডোগ্ করে দাও! অঙ্ক টো অঙ্ক, টার আবার ডোগ্ কোরবো কি? অঙ্কের, ৯ টাকে ডেক্লেই আমার হাসি পায় এমন যে, টা আর বোল্টে পারিনে। ঠিক ডে'ন সেই সারকাসের ঠ্যাং টোলা ডোকারগুলোর মতো। আর ২-টা ডেন পাটিহাস।” তারপর হাত দিয়ে বক দেখানোর মতো করে, দেখিয়ে সে বলে, “গলাটা বাড়িয়ে ডেন চলেছে টো চলেইছে। আর-আর-ঐ যে অঙ্কের ৫-নম্বরটা না?—উরে—বাপ্-রে! ওটা ডে'ন আমাকে ডেক্লেই, হাঁ করে গিলে খেটে আসে! ওদের আবার ডোগ্ করবো কি?”

সহাস্র মুখে ডাক্তার বলে—“তুমি বল্লেই পারতে,—ও আমি জানি না; তবেই তো মিটে যেতো!”

—“টাইটো বলেছিলুম! টখন বলে কিনা,—বাইরণের ঠেই কবিটা টা ব'লতে পারো?—ওটেন্?” “ছাড়ার কথা শুনে শেফালি, ডাক্তারের দিকে চেয়ে, মুহূ হেসে প্রশ্ন করে, ‘বায়রণের, দি ওম্বন্’ কবিতার কথা বলেছিলেন বোধ হয়?”

ছাড়ার কথা মন দিয়ে শুনতে শুনতে, উৎসুক হাসি মুখে

জীবন-সংগ্রাম

ডাক্তার “হ্যাঁ” বলেই,—গ্যাড়ার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, “আর কি কি বলেছিলেন তারপর শুনি ?”

হাতের কর গুণে, গ্যাড়া মুখে কি যেন বিড়বিড় করে নিয়ে, হাত পা নাচিয়ে তখন বলে ওঠে,—“ডাড়াও আগে মনে করে নি! কি সব বিড়্ঘুটে কঠা রে বাবা!” বিলাসের বলা কথা শুলো গ্যাড়া মনে মনে রোমন্থন করে নিয়ে তারপর সে বলে,— “ঠিক মনে পড়েছে। ঠুনে ডাও!—এক নাম্বার বলে,—পিটার ঠাহেবের ‘ঠলিলোকি’ কবিটা-টা বলা। তারপর বলে,—‘ঠেইলার বয়’ ‘ঠেইলার বয়’, টেলিঠন ঠাহেবের কবিটার কথা—। ঠেশ কালে ডেখান বলে,—হয় ‘লুঠ গ্রে’,—নয়টো টেলিঠন ঠাহেবের ‘নাইট ব্রিটেট’ টোমাকে বলতেই হবে, টখন ভয়ে আমার বুকের ভেটের টা, এমন টিপ্ টিপ্ করতে লাগলো ডে আমি ঠুটে পালিয়ে এলুম। টোমার অমন ডাকাটে রোগীর কাছে আমি ঠাক্তে পাল্লুম না বিষ্টু ডা! বই পড়ার কঠা বলে আমার গায়ে জ্বর আসে! ঠোটে বেলায় টা পাটলা পাটঠালার ডিগিন মাষ্টার আমাকে কড়ি কাঠে ঢুলিয়ে মারঠে টেয়েছিল, ইংরেডি পড়তে টাইন বলে। ঠেই ঠেকে, ভয়ে ইটকুল ডিলাম ঠেড়ে। ঠেই আমাকে বলে কি না—ইংরেডি কবিটা বল্টে! বাপ্পের বাপ্প—টুমি অণ্ড লোকের ব্যবস্টা ডেখো। আমাড্ডারা হবে না!”

গ্যাড়ার কথা শুনে, শেফালি ইতিপূর্বেই মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসতে শুরু করেছিল। বিষ্টু ডাক্তার হাসতে হাসতে গ্যাড়াকে

জীবন-সংগ্রাম

বলে,—“তা তোমাকে তো খারাপ কোনও কথা বলেননি ?—
‘ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের লুসী গ্রে’ ‘বাইরণের’ ‘দি ওম্যান’ ‘সেকস্পিয়ানের’
‘হামলেটস্ সলিলোকি,’ ‘টেনিসনের’ ‘চার্জ্ অফ্ দি লাইট্
ব্রিগেড্’ এর প্রত্যেকটা কবিতাই খুব ভালো,—তুমি কোথায়
আগ্রহ করে কবিতাগুলোর অর্থ তাঁর কাছে শিখে নেবে, না—
তুমি এলে ভয়ে পালিয়ে ? আচ্ছা বোকা লোক তো !”

ছ’হাত যোড় করে ঝাড়া বলে,—“রক্ষা’ করো আমার আর
বুড়্টি হয়ে কাড্ নেই ! ভেবেছিলুম টুমি একটা বড় ডাক্তার, টা
ডেক্ছি টুমিও ঐ ঠাগলটার মটোই আবোল টাবোল বোকটে
শুরু কল্লে ? আমি টল্লুম মিনাডির কাছে । টোমাজ্ডারা
কিটু হবে না ।” বলতে বলতে ঝাড়া হন্ হন্ করে হেঁটে ঘর
থেকে বেরিয়ে গেল ! বিষ্টু ডাক্তারের উপযুঁপরি ডাকেও সে
আর একটী বার ফিরে চাইল না ।

ঝাড়ার কাণ্ড দেখে শেফালি প্রশ্ন করে—“এ আপনার
কেউ হয় বুঝি ?”

হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে ডাক্তার বলে,—“আমার আপন
আত্মীয় কেউ নয় । তবে খুব পরিচিত, এবং সে পরিচয়ের প্রথম
এবং প্রধান হেতু হচ্ছে, ওর তোত্‌লানো রোগ—আর স্বভাব
চাঞ্চল্য !”

ডাক্তারের কথা শুনে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি শেফালি প্রশ্ন করে,
“তোত্‌লানো আর স্বভাব চাঞ্চল্যটাও মানুষের রোগ নাকি ?”

“নিশ্চয় ! ওকে আমি এতদিন নেচারস্ ট্রুট্‌মেন্ট করে

জীবন-সংগ্রাম

দেখলুম ! অনেকটা ভালো হয়েছে । বাকী যেটুকু রয়েছে তার জ্ঞান হয়তো আমাকে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে ! একটা বস্তু ওর ভেতরে আপনি লক্ষ করেছেন কি না জানি না ! লোকটা হনুহাট অত্যন্ত সরল ! শিশুকালে ও'র প্রবল টাইফয়েড্ হয়, সেই থেকেই ও অত্যন্ত অগ্রমনস্ক এবং তোতলা হয়েছে,—এটা হচ্ছে ওর বাবার রিপোর্ট ! কিন্তু ওর মস্তিষ্ক পবীক্ষা থেকে আমরা বুঝেছি, যে কোনও সাহসিকতা পূর্ণ কাজ ওর দ্বারা সম্পূর্ণ সম্ভব । এবং এই লোককে সম্পূর্ণ রোগ মুক্ত করতে পারলে, এর দ্বারা যে কোনও গঠনমূলক কাজের সাহায্য হতে পারে ।”

—“কিন্তু লেখাপড়ার কথা শুনলেই ত্রো ও ভয় পায়, গঠন মূলক কাজ করতে হলে বিছা বুদ্ধি চাহতো ?”

“আপনি ভুল করছেন, আসলে ওর সেন্স্-অরগ্যানটাই হচ্ছে ডিফেক্টিভ্ ; এবং সেহেতুই হচ্ছে ওর আসল রোগ । ওর কণ্ঠনালির যেটুকু জড়তা রয়েছে, সেটা অপারেশনে অনেকটা ভাল হতে পারে, কিন্তু আসলে ওর দোষ হচ্ছে সেন্স্-অরগ্যানে ! আপান ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবাণী বললে সহজেই বুঝতে পারবেন, ‘ভিড’ ওর ভিতরে ছুটোই পুবোপুবি রয়েছে । একাদিকে ও যেমান পোসামণ্ড্ অগ্ৰাদিকে দেখবেন ও আবার অপ্‌টামণ্ড্ও বটে । যে কোনও ব্যাপাবে ভয় পাওয়ার অবস্থাটা হচ্ছে ওর আকাম্বক, কিন্তু সেটা ক্ষণস্থায়ী । দেখলেন তো ?—এত যে ডাকলুম এখন ও সাড়া দিলে না, কিন্তু আগামী

জীবন-সংগ্রাম

কালই দেখতে পাবেন ও আবার ঠিক আমার কাছে এসে হাজির হয়েছে !”

—“আপনার কি মনে হয় ওকে সারিয়ে তুলতে পারবেন ?”

চিন্তিতভাবে—ডাক্তার উত্তর দেয়,—“আশা তো কচ্ছি বড়জোর আর মাস তিনেক সময় লাগতে পারে । তবে যদি ও, এরি ভেতরে আবার কোনও একটা বড় অশুখে পড়ে, তা হলে ওকে সারিয়ে তোলা মুশ্কিল হ’য়ে উঠবে !”

“—আচ্ছা ডক্টর চৌধুরী,—মেটাল ডিজিজ্‌ মানুষের ক’ত রকমের হতে পারে ?—” বলেই শেফালি সহাস্য মুখে ডাক্তারের মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ।

বিষ্টু ডাক্তার উত্তর দেয়,—“মনুষ্ট চরিত্রের সব কিছু অতিরিক্ততাকেই আপনি ডিজিজ্‌ বলে ধরে নিতে পারেন !”

“—তার মানে ?”

“—যেমন ধরণ অতিরিক্ত হাসা, অতিরিক্ত কান্না, অতিরিক্ত ভদ্রতা, অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতা, অতিরিক্ত ঞ্চাকামো, অতিরিক্ত কৰ্ম্মতৎপরতা । আরো কতো, রয়েছে, বলে তো সব কিছু বোঝাতে পারবো না । এই হাসপাতালের বিভিন্ন রোগীদের, মাঝে মাঝে ভিন্নভাবে একটু পরীক্ষা করবার চেষ্টা করবেন, তাহলে অনেক কিছুই শিখতে পারবেন ।”

এমনি সময়ে সুসজ্জিতা নাসের বেশে সেই কক্ষে প্রবেশ করেই মিনা ডাক্তারকে বলে উঠলো, “—আপনি এখনো শুতে যান নি ? রাত কতো হয়েছে—তা জানেন ?”—বলেই সে

জীবন-সংগ্রাম

ডাক্তারের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে, সন্দ্বিগ্ন-হিংস্র দৃষ্টি মেলে শেফালির দিকে চেয়ে রইল ।

মিনার সেই ক্রুর দৃষ্টির দিকে নজর পড়তেই, শেফালি উঠে দাঁড়িয়ে, বিস্ময় মুখে ডাক্তারের দিকে চেয়ে, একটা নমস্কার জানিয়েই কক্ষ থেকে বেরিয়ে পরলো !

পাশের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে, বসতে বসতে মিনা বললো—“আপনিও তাহ’লে দল ছাড়া নন দেখছি ?”

—“কোন-দল ?—কিসের দল বলছেন ?” বলে, উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিষ্ট ডাক্তার, মিনার দিকে চেয়ে চেয়ে তার মনের অবস্থাটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলো ।

কক্ষের দেয়ালের দিকে চেয়ে মিনা জবাব দেয়— “ঐ বলুন একটা কথা ।” তারপর ফোঁস্ করে একটা রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করে মিনা একটু নড়ে বসলো ।

মুচ্কি হেসে ডাক্তার বলে—“এই হাসপাতালের রোগীদের দেখে দেখে আপনারো শেষে রোগ ধোরলো নাকি ? বলুন, তা হলে আপনার জন্ম আবার একটা বেডের ব্যবস্থা দেখি !”

“—থাক্ আর আমার বেডের জন্ম আপনাকে ভাবতে হবে না ! ইতিপূর্বে যাব বেডের ব্যবস্থা করেছেন তাকেই আগে সুস্থ করে তুলুন !”

সহসা, বিষ্টুর প্রতি মিনার তীব্র কটাক্ষপাত, আর তার কথা বলার ভঙ্গি লক্ষ্য করে, ডাক্তার ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে অগ্নমনস্কের মত কি যেন ভাবতে লাগলো ।

জীবন-সংগ্রাম

মিনা তাই দেখে মনে মনে ভাবলো,—ঠিক জব্দ হয়েছে !
তখন সে বললো,—“কি ভাবছেন অত ? বিলেতে ফেলে আসা
শ্বেতাজিনী ভাবি প্রেয়সীর কথা ? নাকি ইতিপূর্বে যার বেডের
ব্যবস্থা করলেন তারি কথা ?—তা অ’ত ভাবছেন কেন ? আমি
তো এক্ষুনি চলে যাবো,—তা ছাড়া আপনার মতন একজন
স্বনামধন্য পজিশনাল্ লোকের নামে ছুঁনাম রটিয়ে নিজের
পজিশন্ নষ্ট কববাব ম’ত আকাজক্ষাও আমার নেই !”

মিনার কথা শুনতে শুনতে ডাক্তার রীতিমত বোকা সেজে
কিছুক্ষণ বসে থাকলো । তারপর বললো—“সত্যিই আপনার
কথা আমি পরিস্কার কিছুই বুঝে উঠতে পার্লাম না । কি বলতে
চাচ্ছেন আপনি ? যদি খোলাখুলি বলতেন তা’হলে সত্যিই
খুশী হতাম !”

সহসা মিনার মনের গতি যেন ভিন্ন পথ ধরে চলতে শুরু
করলো । তাহলে বিষ্ট্ ডাক্তার বোধ হয় চরিত্রহীন নয় !
হয়তো হাসপাতাল সংক্রান্ত কোন কথাই সে শেফালির কাছে
বলছিল ! মিনাই হয়তো বুঝতে ভুল করেছে । বিষ্ট্ ডাক্তার
বোধহয় অপবিত্র নয় ! এমনি সব নানাকথা তখন মিনার মাথায়
ঘুরে বেড়াচ্ছিল ।

সহাস্র মুখে মিনার দিকে চেয়ে ডাক্তার বললো—“কৈ
আমার কথার জবাব দিচ্ছেন না-তো ?” তারপর বলে, “বড্ড
ঘুম পাচ্ছে কিন্তু আমার । এবার যদি ছুটি দে’ন তাহলে
একটু ঘুমিয়ে বাঁচি !”

জীবন-সংগ্রাম

—“কোথায় ঘুমুতে যাবেন শুনি ?”

—“কে'ন—ঐ তো কর্ণারেই বিছানাটা পাতা রয়েছে, দেখে ও বুঝতে পাচ্ছেন না ?”

—“ওমা ! অমনি একটা রোগীর ম'ত বিছানা আপনার ? শোবার খাট কেনেননি বুঝি ? ওতে আপনি শুয়ে আরাম পান ? রাত্রির খাওয়া হয়েছে আপনার ?”

—“না,—ঐতো খাটের পাশেই ছোট টেবিলটাতে খাবার ঢাকা দেয়া রয়েছে ।”

“—কি খাবেন আপনি রাত্রে ?”

“—দেখুন না একটু এগিয়ে গিয়ে ।”

উৎসুক মিনা সহসা চেয়ার ঠেলে উঠেই ডাক্তারের খাবার টেবিলের পাশে গিয়ে প্লেটের ঢাকনাটা তুলেই বলে উঠলো,—
“ওমা একি ! ছ'শ্লাইচ্ মাখন রুটি আর দুটো ডিম সেক ! এই খেয়ে আপনার পেট ভরে ? মাছ, মাংস, পরোটা কিম্বা ভাত ডাল, তবকারী—সে সব তো কিছুই নেই দেখছি ? এই আপনার রাত্রির খাবার ?”

“—কে'ন আপনার বুঝি পছন্দ হচ্ছে না ? রাত্রে তো আমি ঐ সবই খেয়ে আসছি বহুদিন থেকে ।” বলেই ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে বিছানার পাশের কুজো থেকে একটা কাঁচের গ্লাসে করে একগ্লাস জল ঢেলে নিয়ে, খাবার টেবিলে গিয়ে বোসলো । তারপর বললো,—“আজ ভোর রাত্রে যখন আপনার ডিউটী অফ্ হয়ে যাবে, তখন যোগেন বাবুকে একবার বিলাস

জীবন-সংগ্রাম

বাবুর বেডটা, চারতলার ১৬ নম্বর কেবিনে রিমুভ্ করে দিতে বলে যাবেন।” তারপর খাবারের ঢাকনাটা তুলে, ডিম সেদ্ধ দিয়ে একখানা রুটির শ্লাইচ্ মুখে পুরতে পুরতে বললো,— “বিলাসবাবুর রোগ সারতে বড়জোর আর হপ্তাখানেক লাগতে পারে।” তারপর খানিকটা জল পান করে নিয়ে, ডাক্তার বলে,—“মনে হচ্ছে এবার বাৎসরিক ফাংশনে বিলাস বাবুই আমাদের সেক্রেটারীর কাজ করতে পারবেন। রোগীদের মধ্যে ওঁকে আর ফেলে রাখা যুক্তিযুক্ত নয় বলেই, চার তলার ঐ কেবিনের ব্যবস্থা ওঁর জন্যে করেছি।” তারপর ডাক্তার আবার খেতে শুরু কোরলো।

মিনা এতক্ষণ নিজেকে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছিল। ডাক্তারের একটি কথাও তার কর্ণে প্রবেশ করেনি। জানালাব পথে অন্তমনস্ক মিনাব চোখে তখন ভাসছিল, বিরাট প্রেতপুরীর মত হাসপাতালটা। আর তার কাণে আসছিল, রকমারী রোগীর বুক চেড়া কাতরোক্টি, কখনো বা কারো কারো তীব্র আর্তনাদ।

খাওয়া শেষ করে, ঘুম জড়ানো চোখে, তোয়ালেতে হাত আর মুখ মুছতে মুছতে, ডাক্তার বলে উঠলো,—“বেয়াদবি মাপ্ করবেন। এবার আমি শুয়ে পড়ছি কিন্তু!” ডাক্তারের কথা শুনে স্বপ্নোখিতের মতো উঠে দাঁড়িয়ে, মিনা বললো,— “ওঃ-হো! একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম! আমি ডিউটীতে যাচ্ছি। আপনি আপনার দরজাটা ভেজিয়ে দিন।” সে কথার উত্তরে

জীবন-সংগ্রাম

ডাক্তার বলে—“ওটা খোলাই থাকে, আমি শুধু ওই লাইট-টা ডিম করে দিয়ে শুয়ে পড়বো।” বলেই ডাক্তার বিছানার দিকে অগ্রসর হোল !

মিনা বলে—“এত খাটনির পর ঘুম, এরপর যদি আবার ডাক্তার আর নামেরা আপনাকে ডেকে ডেকে জ্বালাতন করে ? সেইজন্যই বলছিলুম। দরজাটা বন্ধ করেই ঘুমোলে হোত না ?” “সহানুভূতির জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ! রাতের ভেতরে ডাক্তার আর নামদের কিছুটা বিরক্ত সহ্য করবো বলেই তো এই ব্যবস্থা করে নিয়েছি, আর তাতেই তো আমার আনন্দ ! আপনি কিছু ভাববেন না, দু’ ঘণ্টা ঘুমলেই আমি আবার সতেজ হয়ে উঠবো ;—আর সেটুকু সময় এঁরা আমাকে দিয়েও থাকেন। তাতেই তো আরামে ঘুমুতে পারি।” কথা শুনে মিনা আশ্বস্ত আশ্বস্ত ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেবিয়ে পড়লো। তখন ডাক্তার গিয়ে, বিছানার পাশের ডিম লাইটের সুইসটা টিপে দিয়ে শুয়ে পড়লো !

মিনা একটা বারান্দার রেলিংএর ধারে এসে দাঁড়িয়েছিল। আজ আর তার কিছুই ভাল লাগছিল না। সমস্ত দেহ মন যেন তার, ঐ আত্মভোলা সর্বত্যাগী মানুষটির কথাই শুধু ভেবে মরছিল। এমন সুশিক্ষিত, সর্বগুণসম্পন্ন যুবক, কার জন্য, কিসের আশায়, এতবড় একটা কাজের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে, রাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে মরছে ? নাম এবং যশের নেশা কি এতই প্রবল ? মানুষের আহার, নিদ্রা, বিলাস

জীবন-সংগ্রাম

পর্যন্ত হরণ করে নেয় ! জগতের প্রত্যেকটি কর্মবীরের জীবনই কি এই ডাক্তারেরি মতো অনাশক্ত, দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন ? অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যারা ছ' ঘণ্টার ঘুমকে যথেষ্ট মনে করতে পারে, দেশের কাজ আর পরোপকারের জন্ম যারা নিজের অমূল্য জীবনের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে জলাঞ্জলি দিতে পারে ; নিজের প্রয়োজনের জন্ম যারা পরের কাছে এতটুকুও কাকুতি মিনতি করতে জানে না,—অথচ পরের জন্ম, সমগ্র জাতির জন্ম, ধনীর ছুয়াবে হাত পেতে ভিক্ষা মাগতেও যাদের এতটুকু অপমান বোধ হয় না ; তারাই কি জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ ? মিনার মনে একবার অনুশোচনা এলো ! শেফালিকে ডাক্তারের সঙ্গে আলাপে রত দেখে মিছেমিছিই সে সন্দেহ করেছিল বলে । মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে মিনা যেন বাঁচলো এতক্ষণে !—না—না এমন করে এ সমস্ত লোকের সম্বন্ধে ভুল চিন্তা করতে নেই, এরা সাধারণ মানুষের আলাপ আলোচনার অনেক উপরে ।

সহসা এক অজানা আনন্দের পূর্ণতায় মিনার চক্ষু ভল ভরে উঠলো । শুধু হাসপাতাল নয়—সারা বিশ্বের প্রত্যেকটি প্রাণী তখন ঘুমে কত যে অচৈতন্য, তা বোধ করি মিনার চাইতে কেউ সেদিন আর বেশী করে উপলব্ধি করতে পারে নি !

শেষ রাত্রির দিকে সহসা কি মনে ভেবে, ডাক্তারের কক্ষে প্রবেশ করে ঘরের বাতির সুইচ-টা নিবিয়ে দিয়ে মিনা ডাক্তারের মাথার পাশের জানালাটা খুলে দিতেই, ছ-ছ করে এক ঝলক বাতাস এসে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লো ।

জীবন-সংগ্রাম

অন্ধকারের ঘোর তখনো একেবারে কেটে যায় নি। রাত্রি যেন প্রভাতের ছুয়ারে বিদায় নেবার জন্য মাথা কুটছে। কালো যবনিকার প্রাচীর ভেদ করে ভোর গগনের অঙ্গণে কে যেন তখন রঙের আঁবির মাথিয়ে দিচ্ছিল। মিনা তখন ঘুমন্ত ডাক্তারের কক্ষের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে, অশ্রুমনস্ক মত গাইতে শুরু করলো—

গান

যুম কি মানে না মান' কাটেনা কি নিশি জাগি
বসিয়া নিরালে আজি, এসোনা দুজনে থাকি ॥

আকাশে চাঁদিনো জাগিয়া একেল',
কাবে লয়ে করে অতো হাসি খেলা ?—
তারি পানে চেয়ে কুহ কুহ রবে
কোকিল' উঠিছে ডাকি ॥

ক'ত কথ' মোর ক'ত গান প্রিয়
শোনাবো তোমা'রে ওগো বরলীয়,—

তুমি রবে মোর মুখ পানে চেয়ে,
কব কথ' আমি শুধু গান গেয়ে,—
হবে নিশি ভোর, তুমি রবে মোর
নয়নে স্বপন মাধি ॥

পনরেরা

সেদিন ভোর বেলা ঘুম ভেঙে উঠে রেবতী বাবু চা-পান করছিলেন। হঠাৎ খবরের কাগজের একটা সংবাদ বিশেষের প্রতি তাঁর নজর পড়লো। ঘটনাটা খুবই তুচ্ছ কিন্তু তবুও তার সঙ্গে যেন অনেক বেদনার আভাস জড়ানো ছিল। রেবতী বাবুর মনে পড়লো,—মানুষের পশু-প্রবৃত্তি মহাত্মা গান্ধীকেও গুলি করে হত্যা করেছে। সেখানে বাঙ্গালীকে তার ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়াটা আর তেমন বেশী মারাত্মক কি? কিন্তু রেবতীবাবু ভাবছিলেন মানুষের বর্তমান রীতিনীতি এবং চরিত্রের কথা। গত ১৬ই আগষ্টের দাঙ্গাতেও বাঙ্গালী তার চরম সাহসের পরিচয় দিয়েছে। অথচ সেই বাঙ্গালীর বীর সন্তানেরা আজ কোন্ দুর্বুদ্ধিতে, নিজের দেশের ভিটেমাটি ছেড়ে, যাযাবরের মতন জীবন যাপন করতে, বিদেশে, বিভূঁয়ে, বেরিয়ে পড়লো? দেড় শত বৎসরের পাশ্চাত্য কুশিক্ষার প্রভাব, জাতিকে অধার্মিক এবং অর্ধাচিন করে তুলেছিল পূর্ব থেকেই। তার ওপরে সহরের এই অতি আধুনিক সৌখীন জীবন যাপনের মোহ, মানুষকে ভীকু এবং দুর্বল করে তুলেছে প্রচুর। তাছাড়া চাকরীর নেশা আর উচ্চ-নীচের বৈষম্য, বাঙ্গালীকে আজ এমনি এক পর্যায়ে এনে ফেলেছে, যে, তার ভেতর থেকে, তাকে আবিষ্কার করা সত্যিই মুশ্কিল হয়ে উঠেছে।

জীবন-সংগ্রাম

অথচ এদের সজ্জশক্তিকে পুনর্জীবিত করবার চেষ্টা, কেউ করছেন বলেও তো মনে হচ্ছে না! কংগ্রেস? কারা তৈরী করে বাঁচিয়ে রেখেছিল এই কংগ্রেসকে? কারা দেশের স্বাধীনতার জন্ম, দলে দলে জেলে পাঠে মরেছে? কাবা ফাঁসীর মধ্যে দেশের জয়গান গাইতে গাইতে হেলায় অমূল্য জীবন উৎসর্গ করেছিল? আজ বৃটিশের ভারত শাসন হস্তান্তরের মূলে কি নেতাজীর ঈশ্বর অভিযানের দুর্জয় প্রচেষ্টা, এতটুকুও কাজ করেনি? সেই বাঙ্গালী আজ, নিজেদের তৈরী কংগ্রেসের বাইরে দাঁড়িয়ে, কাকে বিদ্রূপ করে, নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে, স্বাপদ সঙ্কুলের ম'ত পথে, ঘাটে, তেপান্তরে, যাযাবরের জীবন যাপন করেছে? দেশের দাসত্ব শৃঙ্খল মোচন করতে গিয়ে সেদিনও যে বাঙ্গালী সজ্জবদ্ধভাবে বৃটিশের গোলাবারুদ আর অত্যাচার হেলায় উপেক্ষা করেছে, স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপনাত হয়ে, সেই জাতি আজ দলাদলির কুচক্র পড়ে, নিজেদের অস্তিত্ব নিশ্চূল করতে উদ্ধত হয়েছে! সহসা নিজের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে রেবতীবাবু চিন্তা করতে লাগলেন। দেশের জন্ম, স্বাধীনতার জন্ম, তিনি নিজে বহুবার জেল খেটেছেন, বহু লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন, কিন্তু তাতে হয়েছে কি? তিনিও তো বাঙ্গালী, কেন তিনি নতুন ভাবে কাজ শুরু করে, এদের গলদ কোথায়-দেখাবার চেষ্টা করছেন না? কেন তিনি তাঁর অগণিত কমিউনিস্টদের পুনরায় দেশের কাজে উদ্বোধিত করে তুলছেন না? দেশের

জীবন-সংগ্রাম

স্বাধীনতা অর্জন করা, আর লব্ধ স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে রাখার ভেতরে যে পার্থক্য রয়েছে, সেটা তাদের বুঝতে না দিলে, তারা কাজ ক'রবে কোন ভরসায় ? হুজুগের নেশা, জাতিকে আজ পুরোপুরিভাবে বর্জন করতে হবে। স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে তখন সেটার প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট ; কিন্তু আজ দেশরক্ষার ব্যাপারে— চাই স্থির বুদ্ধি আর সুস্থ মস্তিষ্ক !

ক্ষীরোদের মেন্টাল হাসপাতাল আজ দাঁড়িয়ে গিয়েছে, সেটা রেবতীবাবুর একটা ভরসাস্থল। সেখান থেকে গুটি কয়েক কম্বি তিনি সহজেই সংগ্রহ করে ফেলতে পারেন, তা ছাড়া পুরানো কম্বিরা তো রয়েছে। ওদিকে, সত্ত্ব রোগমুক্ত বিলাস একখানি দৈনিক পত্র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করে, দল নিরপেক্ষভাবে মতামত প্রচারে উদ্যোগী হয়েছে ; মুখপাত্র হিসেবে সেটাও তাঁর অনেকখানি কাজে লাগবে। ইতিপূর্বে সে সম্পর্কেও রেবতীবাবুর, বিলাসের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। অতএব এর পর তো আর নতুন উদ্যম নিয়ে, দেশের শাস্তি প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রসর হতে না পারার কোনও কারণ থাকতে পারে না রেবতীবাবুর ?

রেবতীবাবু উঠে দাঁড়ালেন। কাজ তাঁকে আজ থেকেই শুরু করতে হবে। ঘরে পায়চারী করতে করতে তিনি ভাবতে লাগলেন,— কি ভাবে কাজ শুরু করা যায় ! সহসা দেয়াল ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই তিনি দেখলেন, আটটা বাজতে আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকী। হাসপাতালের বাষিক উৎসবে আজ

জীবন-সংগ্রাম

তাকে যোগ দিতে হবে। তার মনে পড়লো, ঠিক সাড়ে আট-টাতেই সভাপতি মিঃ বাম্বুর আসরে অবতীর্ণ হবার কথা। তিনি স্নানের সরঞ্জাম নিয়ে বাথরুমের দিকে যাত্রা করলেন।

* * * * *

‘সরোজ সেবা সদনের’ বিরাট প্রাঙ্গণে, হাসপাতালের আড় দ্বিতীয় বায়িক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে! উৎসব প্রাঙ্গণের পশ্চাতে সুপ্রসস্তু বিভিন্ন হাসপাতাল বাড়ীর দ্বোতলা এবং তেতলার গাড়াবারান্দায়, কস্মে রত, ব্যস্ত ডাক্তার, ছাত্র, এবং নাসেরা, চলার পথে সহসা খেমে খেমে, দাঁড়িয়ে তাই দেখে খাচ্ছিল। উৎসব প্রাঙ্গণের দক্ষিণে ছিল ইমার্জেন্সী ডিপার্টমেন্টের বিরাট মেডযুক্ত একটা চত্বর; সেখানে সারিবদ্ধ ভাবে কয়েকখানি এম্বুলেন্স দাঁড়িয়েছিল। আর বামে ছিল হাসপাতালের আউট-ডোর ডিপার্টমেন্ট। রোগীরা যার যার মত ওষধ নিয়ে, ছেলে মেয়ের হাত ধরাধরি করে সেখান থেকে পর পর বেরিয়ে আস'ছিল। হাসপাতালের গেটের দু'পাশের বড় রাস্তায়, নানা ধরণের মোটর, ঘোড়-গাড়ী এবং ট্যাক্সি অপেক্ষা কর'ছিল।

সভাপতি মিঃ বাম্বুর মোটর গেটের মুখে আবির্ভাব হতেই, ব্যাড পরিচিত ব্যক্তিবাহারা একদল ছাত্র, ‘বন্দে মাতারম’ এবং ‘জয়-হিন্দ’ শব্দে, ভারতীয় কায়দায় অভিনন্দন জানিয়ে তাকে গাড়া থেকে নামাণো। সভাস্থ ব্যবস্থাপক মণ্ডলা তখন বিপুল ‘বন্দে মাতারম’ ধ্বনির ভেতনে—রুমারী টাটকা ফুলের এক

জীবন-সংগ্রাম

বিরাট মালা, মিঃ বাসুর গলায় পরিয়ে, তাঁকে তাঁর সুনির্দিষ্ট আসনের সম্মুখে নিয়ে উপস্থিত করলেন। মিঃ বাসু আসনে উপবেশন করবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যণ্ডবাণধারী কাম্বিদল, কাড়া নাকারা সংযোগে ব্যণ্ড্ বাজিয়ে গাইতে শুরু করলো—

গান।

চলরে চল—চল—চল, কাজের পথেই এগিয়ে চল ।
কি পেলি আর কি পেলি না—হিসেবে তার কাজ কি বল ॥

(চলরে—চল—চল—চল)

বিশ্বে চলার মাহুষ যারা যোদের নবীন জীবনে রবে না—
পেছন ফিরে চায়না তারা, ক্রান্তি, হিংসা, লেশ ;
বিপদ বাধা আসুখ না ভাই— দুর্বার গতি চলিব আমরা—
খাকণে মোরা অশিচল ॥ দলিয়া সকল ক্রেশ ;—

(চলরে—চল—চল—চল)

কাজের যে আছো এসো যোয়ান্
স্বার্থক করো—এ—অভিযান ;—
স্বাধীন ভারতে গড়িব আমরা—
শৌর্য্য, শান্তি, স্বাস্থ্য, বল ॥

(চলরে—চল—চল—চল)

গানখানি শেষ হয়ে যেতেই মিঃ বাসু উঠে দাঁড়িয়ে জনতাকে অভিনন্দন জানিয়ে, শুরু করলেন—

“আমার দেশের প্রিয় ভ্রাতা ভগ্নীগণ-- আজ আপনাদের এই

জীবন-সংগ্রাম

উৎসবে এসে আমি এক নূতন প্রেরণার আভাস পেলুম। কম্বিন্দলের এই সুমহান সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে, হাসপাতালের উৎসব উপলক্ষে, আপনারা আজ দেশের আপামর-জনসাধারণের মনে যে সুপ্রতিষ্ঠার ছাপ এঁকে দেবার জন্য বন্ধপরিষ্কার হয়েছেন, তাতে জাতি উদ্বোধিত হবে। স্বাধীনতার দ্বার প্রান্তে এসে, নানা সমস্যায় জর্জরিত, কিংকর্তব্য-বিগৃঢ় নগরবাসী আমরা, আজ যে ভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছি, তাতে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে শুধু নূতন প্রেরণার। কিন্তু সেই প্রেরণার উৎস আজ যদি আমরা সর্বান্তঃকরণে আমাদের দেশের অগণিত যুবক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের তরফ থেকে আন্তরিক ভাবে না পাই;—তা হলে ছুঃখ্য রাখবার আর আমাদের জায়গা থাকবে না। যুগে-যুগে, সর্বদেশে এবং সর্বকালে স্বাধীনতা রক্ষা করে এসেছে সেই দেশেরই অগণিত সুশিক্ষিত যুবক যুবতী বৃন্দ। আমাদের প্রবীন অভিজ্ঞতা, সূচু কৰ্ম পরিচালনার পক্ষে, ক্রমশঃ স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়ে আসছে। আজ তাই আমাদের বিপুল কৰ্মভার, দেশের যুবক-যুবতী-বৃন্দের হস্তেই গুপ্ত করে নিশ্চিত হতে চাই। আজ আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে স্থিরবুদ্ধি-সম্পন্ন-সুশিক্ষিত কম্বিন্দর,—যাঁরা বিপদ বাধাকে তুচ্ছ করে, দেশকে তাঁদের সুচিন্তিত কৰ্মের ভেতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। সর্বান্তঃকরণে আজ আমি বিশ্বনিয়ন্ত্রার চরণে প্রার্থনা করছি, আপনাদের সেই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক। জয় হিন্দ।”

তারপর ডাক্তার ক্ষীরোদ চৌধুরীর মুখে হাসপাতালের

জীবন-সংগ্রাম

বার্ষিক কার্যবিবরণীর বিবৃতি—শুনে, অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে দিতে মিঃ বাসু সভাস্থ ভদ্রমণ্ডলীর কাছে বিদায় গ্রহণ করে, নিজের মোটরে উঠে হাসপাতালের প্রাক্গণ পরিত্যাগ করলেন ।

মিঃ বাসুর মোটর গেটের বাইরে বোররে যাবার পর দেখা গেল—একখানি রোজরয়েস্ মোটরে কবে রেবতীবাবু,—সরোজ রায় চৌধুরী ও লতিকা দেবীকে নিয়ে, বক্তৃত্তা মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছেন ।

বিভিন্ন আসনে উপবিষ্ট, ধীরেনবাবু, বিলাস, মাধবী দেবী, সকলেই সরোজ রায় চৌধুরীর এই আকস্মিক আবির্ভাবে মনে মনে রেবতীবাবুকেই এর উদ্যোক্তা মনে করে, পরস্পর পরস্পরের প্রতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মখ চাওয়া-চাওই করতে লাগলেন ।

কিংকর্তব্য-বিমূঢ় ক্ষীরোদ ডাক্তার তখন সহসা তার বক্তৃত্তা বন্ধ করে, অনিচ্ছা সত্ত্বেই বক্তৃত্তা মঞ্চ থেকে নেমে আগন্তুক দিগের সম্বন্ধনার জন্ম মোটরের দিকে পা বাড়ালো । কিন্তু তার পূর্বেই ধীরেনবাবু, মিনা আর শেফালি, মোটরের পাশে উপস্থিত হয়ে, তাঁদের সমস্থানে বক্তৃত্তা মঞ্চের পাশে এনে তিন খানি চেয়ারের ব্যবস্থা করে দিলেন । ক্ষীরোদ ডাক্তার তখন উৎসব-কর্ম-সূচীর অবশিষ্ট কাজটুকু সুসম্পন্ন করার জন্ম রেবতীবাবুকে অনুরোধ করলো !

অজানিত, আকস্মিক এই উৎসব প্রাক্গণে অনাহতের মত উপস্থিত হয়ে, একদিকে সরোজ রায় চৌধুরী এবং লতিকা দেবী যেমনি অস্থস্থি বোধ করতে লাগলেন, অন্যদিকে তেমনি মাধবী

জীবন-সংগ্রাম

দেবী, সুপ্রিয়া এবং ক্ষীরোদ ডাক্তারও সহসা কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। সরোজ সেবা সদনের নাম শুনে, মাধবীর মনে গোড়া থেকেই কেমন যেন একটা খটকা লেগেই ছিল; কিন্তু স্বামীর চিকিৎসার ভেতর দিয়েও সে ইতিপূর্বে কোনদিনই তার নিজের ভাই ক্ষীরোদ ডাক্তারের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায়নি। পাশাপাশি আজ এই বিরাট জনমগুলীর ভেতরে, পিতা, মাতা এবং ভ্রাতাকে চাক্ষুষ দেখতে পেয়ে, সহসা মাধবীর মাথাটা যেন কেমন ক'রে উঠতেই হাত ইসারায় মিনাকে ডেকে সে তাকে স্থানান্তরে নিয়ে যাবার জন্ত অনুরোধ করলো। মিনা তখন তাকে উৎসবের আসন থেকে উঠিয়ে নিয়ে, হাসপাতালেও ওয়েটিং রুমে রেখে এলো।

সুপ্রিয়া ভাবছিল অতীত জীবনের কথা। মিনার দাদা এক ধীরেনবাবুর কথা সুপ্রিয়া ইতিপূর্বেই শুনেছিল। অথচ এখানে কে এই লোকটা? অবিকল যেন কলেজ লাইফের সেই ব্যক্তিটি?...

বিলাস অন্য সব তেমন সক্ষম করেনি। সে তখন ভাবছিল তাব ফেলে আসা জীবনের বিপর্যাস্ত দিনগুলির কথা। শ্বশুর শাশুড়ী এবং শ্যালক ক্ষীরোদকে সে ইতিপূর্বেই চিনতে পেরেছিল, কিন্তু সে-জন্ত তাদের সঙ্গে সহসা পরিচিত হবার আকাঙ্ক্ষা তার এতটুকুও ছিল না। তার মুখের চেহারা দেখে, লজ্জায় কিম্বা অভিমানে যে তটস্থ হয়ে উঠছে সে তেমনও কিছু কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল না। যেখানে ছিল, সেইখানেই সে

জীবন-সংগ্রাম

তেমনি নির্বিষকার চিত্তে বসে, রেবতীবাবুর কৰ্মতৎপরতা চেয়ে দেখছিল। অরুণ, মাঝে মাঝে এক একবার বিলাসের কাছে ছুটে গিয়ে, নবাগত ব্যক্তিবর্গের পরিচয় তার কাছে জেনে নিয়ে, উৎফুল্ল মনে, হ্যাট কোট প্যাণ্ট পরিহিত ছোট্ট দেহ ছলিয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করে বেড়াচ্ছিল। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হলে, সে কখনো বা গলার রুমালটাকে খুলে নতুন করে বেঁধে নিচ্ছিল : কখনো বা মিনার কাছে ছুটে গিয়ে, এটা, ওঠা, সেটা, জানবার জন্তু তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলছিল।

ওদিকে, রেবতীবাবুকে আজ সত্যিই ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। শুভ্র খদরের পোষাকে অচ্ছাদিত বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহে, সৌম্যদৃষ্টি নিয়ে, তিনি যখন ক্ষীরোদের দেওয়া কৰ্ম্মসূচী হাতে করে, সভাপতির আসনের পাশে গিয়ে অগণিত উৎসুক জনতার দিকে তাকালেন, তখন তার বক্তৃতা শোনবার জন্তু সমবেত জনতা তাঁকে মুহূৰ্ত্তে 'জয়হিন্দ' এবং 'বন্দেমাতরম', ধ্বনিত্তে আপ্যায়িত করতে লাগলো। করজোড়ে তাঁদের সেই অভিনন্দন গ্রহণ করে, জনতাকে বসবার জন্তু অনুরোধ জানিয়ে রেবতীবাবু শুরু করলেন,—

“এই বাৎসরিক উৎসবে যোগদানে, আমার বিলম্ব হওয়ার জন্তু, মিঃ বাসুকে এটোন্ করতে পারি নি। সেজন্য প্রথমেই আমি আপনাদের কাছে মার্জনা চাইছি। কিন্তু এই বিলম্বের জন্তু আজ আমি ষাঁদের এই উৎসবে এনে হাজির করতে

জীবন-সংগ্রাম

পেরেছি, তাঁদেরি কৃপায় আজ আপনারা ডাক্তার ক্ষীরোদ চৌধুরীর মত ব্যক্তিকে পেয়েছেন।”

তারপর একে একে, সরোজ রায় চৌধুরী, ধীরেন বাবু এবং ক্ষীরোদ ডাক্তারের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে, তিনি বোলতে শুরু করলেন,—“সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সরোজ রায় চৌধুরী যিনি আমার দক্ষিণে সম্মুখ বসে রয়েছেন, এঁরই নামানুসারে এই হাসপাতালের নামাকরণ করা হয়েছে— ‘সরোজ সেবা সদন,’ ডাক্তার ক্ষীরোদ রায় চৌধুরী হচ্ছেন এঁরই সুযোগ্য পুত্র : কিন্তু এই হাসপাতালটি ঘাঁরা প্রচুর অর্থ এবং আসবাব পত্র দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলবার কাজে সাহায্য করেছেন, তাঁদের উদ্যোক্তা হচ্ছেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়, যিনি আমার এই পার্শ্বের আসনে সমাসীন রয়েছেন।” নাম উচ্চারণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সরোজ রায় চৌধুরী এবং ধীরেন বাবু, উঠে দাঁড়িয়ে জনতাকে অভিনন্দন জানিয়ে, আবার নিজ নিজ আসনে উপবেশন করলেন। রেবতীবাবু বলে চললেন,—

“এইখানেই আমার বক্তব্যের শেষ নয়। ‘সরোজ সেবা সদন’ যদিও গুটীকয়েক অক্লান্ত কন্মির নিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু তবুও সর্বোতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার কাজ এখনো এর নিম্পন্ন হয় নি। তবে আশা আছে, প্রাথমিক কাজ যখন নানা বাধা বিপত্তির ভেতর দিয়েও সম্পন্ন হতে পেরেছে, তখন বাকী কাজ একদিন এর নিশ্চয়ই সুসম্পন্ন

জীবন-সংগ্রাম

হবে।” এমনি সময়ে লতিকা দেবী, রেবতীবাবুর সম্মুখে সহসা এগিয়ে গিয়ে কি যেন তাঁর কানে কানে বলেই আবার নিজের চেয়ারে গিয়ে উপবেশন করলেন। রেবতীবাবু তাঁর থামানো কথার সূত্র ধরে পুনরায় বলতে শুরু করলেন,—

“কিন্তু এই একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাই আজ আমাদের সব নয়! দেশের এই নবলব্ধ স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপরে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলতে হলে, ‘সরোজ সেবা সদনের’ মত আরো হাসপাতাল ছাড়াও—আজ চাই আমাদের প্রচুর বিদ্যালয় এবং শিক্ষাকেন্দ্র। যেখান থেকে দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র ছাত্রী যন্ত্রবিদ্যা এবং শিল্পকলায় সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে! আমাদের মনে রাখতে হবে, এ দেশের ধনশালী ব্যক্তির, আমাদের কোন নবীন প্রচেষ্টাকেই গোড়ায় সমর্থন করবেন না। তার কারণ, আমাদের কর্মশক্তিতে তাঁদের আস্থা নেই। কিন্তু যদি তাঁরা দেখতে পান, অনেক পরিশ্রম করে, অনেক খেটে খুটে, কোনও রকমে আমরা একটা কিছু খাড়া করেছি; তখন তাঁরা অন্ততঃ নাম কেনবার মোহেও, আমাদের কিছু কিছু সাহায্য করবেন। যেমন ধরুন একটা উদাহরণ দিচ্ছি এই হাসপাতালের ব্যাপার নিয়ে। মিসেস্ রায় চৌধুরী একটু পূর্বেই আমাকে সরোজ সেবাসদনের ফণ্ডে তিন লক্ষ টাকা দান করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অথচ গোড়ায় যদি আমরা তাঁর কাছে গিয়ে, মাত্র পাঁচটা টাকাও সাহায্য চাইতাম, তা হলে কিন্তু তিনি পাঁচটা পয়সা দিয়েও তখন আমাদের সাহায্য

জীবন-সংগ্রাম

করতেন না ! কথাটা অপ্রিয় সত্য, এবং সে জ্ঞান্য মিসেস চৌধুরীর কাছে, আপনাদের সমক্ষেই আমি মাপ চাইছি । আসলে, এমনিই রক্ষণশীল মনোবৃত্তি হচ্ছে দেশের ধনীক সম্প্রদায়ের । কাজেই দেশকে সর্ব্বোত্তমভাবে গড়ে তোলবার ব্যাপারে, আমরা যদি নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্মে গা ভাসিয়ে দিতে না পারি, তা হলে আমাদের এই স্বাধীন দেশের অগ্রগতি, অন্ধ ভবিষ্যতের মতোই অন্ধকারে ডুবে থাকবে । ধনীকেব ব্যাঙ্কের গচ্ছিত অর্থ,—অথবা তাঁদের সিন্ধুকে রক্ষিত টাকার স্বপ্ন চিন্তায়, দেশের লোকের উপকার কোনদেশেই হয়নি । অতএব আমাদেরও তা হবে না । অর্থের চাইতেও প্রচুর প্রয়োজন হচ্ছে আজ এ দেশে নিরপেক্ষ কর্ম্মির ! দেশের অগণিত সুশিক্ষিত ছাত্রছাত্রীরাই হচ্ছেন সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মি । সংগঠনের কাজে, তাঁরা যদি আজ ণায় নিষ্ঠভাবে অগ্রসর হয়ে গঠনমূলক কর্ম্মের প্রস্তাব, প্রতিবেশীর চক্ষুর সম্মুখে মেলে ধরতে পারেন, তাহলে উপকরণ—অর্থাৎ, অর্থের অভাবে তাঁদের কাজ নিশ্চয়ই পড়ে থাকবে না । আমরা তখন দেখতে পাবো, বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে, আমাদের দেশ-ও অণ্ড পাঁচটা স্বাধীন দেশের মতই—শিক্ষায়, দিক্ষায়, শৌর্য্যে, সাফলো, সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে । আপনারা কি বলতে পারেন—সেদিন আর আমাদের কতদূরে ?” রেবতী বাবুর প্রশ্নের উত্তরে, সভাস্থ ছাত্রছাত্রীরা সমবেত কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো—“বেশীদূরে নয়—আর বেশী দূরে নয়” । রেবতীবাবু

জীবন-সংগ্রাম

বললেন—“আপনাদের আমি আমার স্বশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি ! ‘জয়হিন্দ’ !”

তারপর কম্বিদলের ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনির ভেতরে সভা ভঙ্গ হলো ।

ষোল

উৎসব শেষে, ভারাক্রান্ত মনে, সরোজ রায় চৌধুরী তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে যখন মোটরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন,— তখন লতিকাদেবী দেখতে পেলেন, পূর্ব থেকেই একটা ছয়-সাত বৎসরের বালক, তাঁদের মোটরের পা দানিতে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে যেন কি সব কথা বোলছে । গোড়া থেকেই লতিকাদেবী লক্ষ করেছিলেন, এটা ছেলেটি নিজের পরিপূর্ণ উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে, ইতিপূর্বে সভাস্থ বহু নরনারীর আনন্দের খোরাক জুগিয়েছে । এক সময়ে তাঁর মনে হয়েছিল ঠিক যেন বিলাসের মতো একটা লোকের কাছে ছেলেটি বার-কয়েক যাতায়াত করেছে । উৎসব শেষে তিনি কিন্তু আর সে লোকটিকে সেই চেয়ারে দেখতে পাননি ! সেই ছেলেটিই কি তাঁদের মোটরের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে ?

দ্রুতপদে লতিকাদেবী মোটরের কাছে এগিয়ে গেলেন । ছেলেটির দিকে হেসে তাকাতেই সে বলে উঠলো,—“এটা

জীবন-সংগ্রাম

বুঝি তোমাদের মোটর ?” কথা শুনে, লতিকা দেবী বালকটিকে জড়িয়ে ধরে, গালে চুমো খেতে খেতে বললেন,—“চড়বে তুমি এই মোটর গাড়ীতে ? এসো দরজা খুলে দিচ্ছি ।”

ড্রাইভারের হস্তক্ষেপে সহসা মোটরের দরজাটা খুলে গেল ।—আর তক্ষুনি, ছেলেটি গিয়ে মোটরের গদি আটা বিরাট তুলতুলে সিটের ভেতরে বসেই যেন একেবারে ডুবে গিয়ে, প্রাণপণে উঠে বসবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো । লতিকা দেবী তখন ভেতরে প্রবেশ করে. তাকে কোলে টেনে তুলে, পাশের শক্ত একটা জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বললেন—“তুমি বুঝি আর কক্ষনো মোটরে চড়নি ?”

ছেলেটি বললো,—“তা কেন ? আমার মিনা পিসিদের তো একটা মোটর রয়েছে ; তাতে কতদিন চড়েছি । সেটা খুব ভালো মোটর ! তোমাদের এ মোটর-টা এমন গর্ত হয়ে যায় কেন ? গাড়ীর তলায় তোমরা কোনদিন পড়ে যাও যদি তখন কি হবে ?”

হাস্তে হাস্তে লতিকা দেবী বলেন,—“তা পড়তে যাবো কেন ? এটা দামী মোটর কিনা, তাই সব বসবার জায়গাগুলো খুব নরম ! তুমি ছোট্ট মানুষ যে—তাই তো ডুবে গিয়েছিলে ! কিন্তু এখন কেমন সুন্দর জায়গায় বসিয়েছি ? তোমার পিসিদের মোটর তো এটার চাইতে ঢের ছোট্ট ! তাই নয় কি ?”

রেবতী বাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সরোজ রায়, মোটরের সামনে এসে, সোনায় বাঁধানো বেতের লাঠিটায় বাঁ হাতে

জীবন-সংগ্রাম

ভর দিয়ে, ডান হাতে মোটরের দরজার খোলা হাতলটা টেনেই—বিস্ফারিত নেত্রে লতিকা দেবীকে প্রশ্ন করলেন,—“কে এই ছেলেটি লতু ?” জবাবের সঠিক উত্তর এড়িয়ে গিয়ে, লতিকা বললেন,—“খোকাকে আমাদের এই মোটর গাড়ীটা দিলে, ও নাকি আমাদের বাড়ী গিয়ে অনেকদিন থাকবে। সেইজন্যই ওকে আমি গাড়ীতে চড়িয়েছি।”

মোটরের ভেতরে প্রবেশ করতে করতে, সরোজবাবু ড্রাইভারকে হুকুম করলেন, দরজা খুলে দিয়ে রেবতীবাবুকে তার পাশে বসিয়ে নিতে ! আর ছেলেটির দিকে চেয়ে হেসে বোললেন,—“তোমার নামটি কি ভাই ?”

সরোজবাবুর দিকে, বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে খোকা ব'লে উঠলো,—“শ্রীঅরুণকুমার রায়। কিন্তু তুমি দেখছি কিছুই জান-না ? আমার মতো ছোট্ট ছেলে আবার তোমার ভাই হ'তে যাবে কে'ন ?” লতিকা দেবী তাড়াতাড়ি খোকার কানের কাছে মুখটা নিয়ে, ব'লে উঠলেন,—“তা তুমি জানোনা বুঝি ? তোমার বাবাঠি তো হচ্ছেন ঐ বুড়োটারো বাবা ! আর আমরা ছ'জনেই হচ্ছি তোমার মায়ের বুড়া ছেলেমেয়ে। আমরা যখন তোমার মায়ের পেটে হয়েছি, তখন তো তুমি পৃথিবীতেই আসোনি, তবে জানবে কি করে—বুড়োটো তোমার ভাই হয় কিনা ?”

“যুচ্ কি হেসে, ছেলেটি গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়, “আমাকে ছেলে মানুষ পেয়ে কি যে সব তোমরা বোলছো, তার আর

জীবন-সংগ্রাম

ঠিক নেই। আমার মায়ের তো মাথার চুলই পাকেনি ! তা তোমাদের মতন বুড়া হাবড়া ছেলে মেয়ে তার পেটে হতে যাবে কেন ?”

চলন্ত গাড়ীর সামনেব সিটে বসে, পেছন ফিরে তাকিয়ে, রেবতী বাবু ছেলেটিকে বললেন,—“ওঁরা তোমাব দাদা মশাই আর দিদিমা হ'ন অরুণ ! মায়ের মুখে গল্প শোননি ? ওদের বাড়ীতে যে তুমি যাচ্ছ ?—তা তোমার মাকে বলে এসেছ তো ?”

রেবতীবাবুর কথা শুনে, মুখ কাঁচুমাচু করে অরুণ বলে উঠলো, “বাবো ! মা-যে তখন কোথায় চলে গিয়েছিল, কি করে তা হলে আমি গিয়ে মাকে বলে আসবো সে কথা ?” খোকার মুখের দিকে দেখে নিয়ে লতিকা দেবী বললেন,— ওঁর কথা শুনে “কেন ভয় পাচ্ছ তুমি ?—তোমার মা যখন শুনবে, তুমি আমার কাছে রয়েছ, তখন সে কিছু বোলবে না কোনদিন তোমাকে !” আশ্বস্ত অরুণ, লতিকা দেবীব মুখের দিকে চেয়ে তখন হাসিমুখে বললো,—“তা তুমি কেমন করে জানলে ?”

“বা-রে ! তোমার মা যে আমার পেটে হয়েছে ! সে যেমন তোমাব মা না ? আমিও ত তেমনি তোমার মায়ের মা হই যে ! আমার কাছে থাকলে—বলতে পারে কোনদিন তোমার মা তোমাকে কিছু ? তোমার দেখছি কিছু বুদ্ধি নেই । লেখাপড়া কর না বুদ্ধি ?”

চোখ পাকিয়ে অভিমানের ভঙ্গীতে অরুণ লতিকা দেবীব কথার উত্তরে বললে—“না লেখাপড়া করিনে,—তোমাকে বলেছে ! চল-ই না আগে তোমাদের বাড়ীটা দেখে নি, তারপর

জীবন-সংগ্রাম

যখন আমি রবিঠাকুর আর কাজী নজরুলের কবিতা তোমাকে শুনিয়ে দেবো, তখন বুঝতে পারবে আমি কতো লেখাপড়া জানি!” তারপর অশ্রুমনস্কের মতো, কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে নিয়ে অরুণ বললো,—“একবার চল-ই না তবে আমাদের বাড়ীতে, মাকে আমি বলে আসি? নইলে মা যদি রাগ করে?”

—“তা করবে কে’ন? তোমার পিসিদের কি টেলিফোন নেই? আমাদের বাড়ী থেকে তোমার পিসিকে টেলিফোনে বলে দিলেই তো তোমার মা জানতে পারবে তুমি আমার কাছে রয়েছ! কেমন তা’হলেই হবে না?” নিশ্চিত হওয়ার ভাবে উৎফুল্ল হয়ে, লতিকা দেবীর কোলে উঠে বসতে বসতে, বন্ধিমানের মতো মাথা নেড়ে অরুণ বলে,—“তা হলেই ঠিক হবে! তোমাদের বাড়ীতেও একটা টেলিফোন আছে বুঝি?”

—“শুধু কি টেলিফোন?—আরো কত কিছু রয়েছে, চল-ই না। সে সব দেখলে তোমার আর ফিবে আসতেই ইচ্ছে হবে না। তখন তোমার মা আবার বাবাকে শুদ্ধ, আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসতে ইচ্ছে করবে!”

কথার উত্তর দিতে ভুলে গিয়ে, অরুণ তখন দেখছিল, মোটর-টা গিয়ে বিরাট একটা রেলিং ঘেরা ফুল বাগানের ভেতরের রাস্তা মাটির পথ দিয়ে, প্রকাণ্ড একটা বাড়ীর গাড়ী-বারান্দার তলায় থেমে দাঁড়ালো! গাড়ী থেকে নেমে বাগানের ফুল গুলোর দিকে নজর পড়তেই, অরুণ একটা রেলিংএর দরজা ঠেলে, সেই বাগানের ভেতর ঢুকে দেখলো, ছোটো লাল-নীল

জীবন-সংগ্রাম

পাখী, ঘাসের ভেতর থেকে, কি যেন সব ঠোট দিয়ে খুঁটে খুঁটে
খাচ্ছে। আর তার একটু দূরেই দেখলো, একজন বুড়ো লম্বাটে
কালো মানুষ, খালি গায়ে, এক একটা গাছের গোড়ায়,
ঝাঁঝরিতে করে জল দিচ্ছে! রাঙ্গা মাটির সরু পথ দিয়ে,
আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে অরুণ দেখলো,—একটা
বড় চৌবাচ্চার জলে, দুটো বড় বড় রাজহাঁস সাঁতার কাটছে!
তাদের গায়েব সাদা পালক আর হলুদে ঠোট দেখে, হাঁস
ধরবার জন্য যেই সে সামনে এগিয়ে গেল, আর অমনি—বড়
হাঁস-টা তার লম্বা গলা বাড়িয়ে ছুটে আসতে লাগলো অরুণের
দিকে! তাই দেখে অরুণ ভয়ে চিৎকার করে উঠলো—! তার
চিৎকার শুনে, সর্ব্বাঙ্গে ছুটে এলো মালী, আর তার পেছনে
পেছনে ছুটে এলেন লতিকা দেবী! তাড়াতাড়ি অরুণ তখন
দিদিমায়ের পেছনে লুকিয়ে, হাঁসটাকে উঁকিমেরে দেখেই
বললো, “বাব্বা! কি ঠোট আর লম্বা গলা! ওগুলো কেন
রেখেছ? কামড়ে গা থেকে মাংস তুলে নেবে যে!” লতিকা
দেবী তখন হাঁসটাকে জাপটে ধরে, সোহাগ করতে করতে
বললেন,—“কৈ কামড়াচ্ছে? তোমায় নতুন দেখেছে কি না?
তাতেই তোমাকে ভয় দেখাচ্ছিল! ওরা কক্ষনো কাউকে
কামড়ায় না। চল বাড়ীর ভেতরে সেখানে আরো কতো কি
রয়েছে দেখবে চল!”

সামনের বড় হল-ঘরটার ভেতরে ঢুকে অরুণ একেবারে
হক্চকিয়ে গেল। কতো বড় বড় সব দেয়াল ছাব! কী সুন্দর

জীবন-সংগ্রাম

বিরাট ঘড়িটার লেজের সঙ্গে ছোট্ট একটা মেয়ে ঘাঁগড়া উড়িয়ে, এখার থেকে ওখারে দোল খাচ্ছে যেন! কত রকমের পুতুল ভর্তি সব কাঁচের আলমারী! কতবড়ো আয়নাটা ঐ ড্রেসিং টেবিলে লাগানো রয়েছে? মিনা পিসিদের-টা ও রকমই নয়!

—“তুমি দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?—আমার সঙ্গে এসো একটু এগিয়ে, কতবড়ো কাকাতুয়া দেখবে এসো।”—বলেই লতিকা দেবী সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। সহসা রেবতী বাবুর হাসির শব্দ ভেসে এলো—সেই হল ঘরটার একপাশ থেকে। অরুণ চেয়ে দেখলো কেমন সুন্দর চক্চকে ছোটো বড় বড় কোঁচের ভেতরে বসে, তার দাছ আর রেবতীজ্যেঠা, কি যেন সব বলাবলি করছে! তারপর কি ভেবে সামনের দিকে একটু এগিয়েই অরুণ দেখলো,—পাশেই একটা মস্তবড় দরজা। কী মোটা কাঠের পুরু পাল্লা তাতে! কোথায় গিয়ে যে মিশেছে তার ঠিক নেই! ওপরের দিকে চাইলেই যেন ঘাড়টা টাটিয়ে ওঠে! খোলা দরজাটার মাঝামাঝি গিয়ে অরুণ দেখলো,—ও পাশের মস্ত শ্বেত পাথরের বারান্দার এক পাশে, লোহার রুডের ওপর পাশাপাশি মাথায় ঝুঁটিওয়ালা ছোটো বড় বড় পাখী বসে রয়েছে! ঐ গুলোই বুঝি কাকাতুয়া? কথাটা ভালো করে জেনে নেবার জন্তু, অরুণ উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে আশে পাশে তার দিদিমাকে খুঁজতে লাগলো।

পাশের বারান্দা পেরিয়ে, কে একজন খান কাপড় পরা মেয়েছেলে, সেই দিকের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যাচ্ছিল; দেখেই

জীবন-সংগ্রাম

তাকে অরুণ ডেকে বললো,—“ওঁকে একবারটি ডেকে দাও না তুমি !” মেয়েছেলেটি অরুণের দিকে চেয়ে একটু হেসে, ঘাড় নেড়ে ওপরে চলে গেল ! সে চল যেতেই, অরুণ আশ্চর্য হয়ে দেখলো,—একখানা লাল টুকটুকে রেকাবি ভরতি, কি সব নিয়ে যে’ন ওপর থেকে তার দিদিমা তার দিকেই এগিয়ে আসছেন । অরুণ তাঁকে দেখেই খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলো,—“বাঃ—রে ! তোমায় কতো খুঁজছিলুম যে ?”

—“খিদে পায় নি বুঝি তোমার ! তাই তো গিয়েছিলুম ! নাও এইগুলো একবার চটপট খেয়ে নাও দেখি, নাহিতে হবে না ? কতো বেলা হোল, ভাত খেতে হবে যে !” এই বলে তিনি ছোট্ট রেকাবি-টা অরুণের হাতে ধরে দিয়ে, আবার বললেন,—“চল, ওপরে বসে বসে খাবে চলো !”

রেকাবি ভরতি চকোলেট, ডিম সন্দেশ, আর বড় একটা কমলালেবু দেখে, পাখীর কথা জিজ্ঞেস করতে অরুণ বেমানুম ভুলে গিয়ে, লতিকা দেবীর সঙ্গে, আনন্দে আনন্দে উপরে উঠতে লাগলো !

ছোতলার ঘরের আসবাব পত্র আর দেয়ালের সব বড় বড় অয়েল পেইনটিংয়ের ফটো দেখে, অরুণের মাথা একেবারেই গুলিয়ে গেল ! এ কোথায় এসেছে সে ? এত বড়লোক এরা ! অথচ বলছে কে’ন এটা নাকি অরুণের দাদুর বাড়ী ? ঐ বুড়োটাই তো অরুণের দাদু—গাড়ীতে দিদিমায়ের পাশে বসে এলো যে ? এই দিদিমা-টা নাকি তারি মায়ের মা

জীবন-সংগ্রাম

হয় ? কিন্তু মা তবে তাকে নিয়ে একদিনও এখানে আসেনি কেন ?

মস্তবড় একটা ছাপর খাটে পা ছুলিয়ে, অরুণকে পাশে বসিয়ে অনেকক্ষণ নাতির দিকে চেয়ে থেকে; লতিকা দেবী একসময়ে বললেন,—“বাঃ-রে ! তুমি খাচ্ছ না কেন ?” সে কথার উত্তর না দিয়ে অরুণ বলে,—“আচ্ছা তুমি যদি আমার দিদিমা ?—তবে আমার মাকে নিয়ে এলে না কেন ?”

বালকের কথায় লতিকা দেবী রীতিমতো মুস্কিলে পড়লেন, কিন্তু মুখে বললেন,—“তোমার বাবা যে আসতে সময় পায় না কিনা ? তাইতো তোমার মা আসে না ! ঐ তো তোমার মা আমার ঘরেই রয়েছে !” বলেই লতিকা দেবী একটা বড় অয়েল পেইনটিংয়ের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করলেন । অরুণ তৎক্ষণাৎ সেই ফটো-টার সামনে ছুটে গিয়ে দেখলো, সত্যিই তো তার মা ! বোগলে ক’খানা বই নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ? এগিয়ে গিয়ে লতিকা দেবী তখন ক্ষীরোদ ডাক্তারের ফটো-টা দেখিয়ে বললেন,—“একে চেনো ? ইনি তোমার মামা হন !” দিদিমার কথায় উৎফুল্ল হয়ে অরুণ বলে উঠলো,—“হাসপাতালের সেই বড় ডাক্তার বুঝি ? ভারি আশ্চর্য্য তো ? আমার মামা হবে কেন দিদিমা ?”

—“তোমার মায়ের আপন ছোটভাই যে ! কথা বলেছো তুমি ওর সঙ্গে ?”

—“না—তো ! বাবার যখন অসুখ ছিল, আমি মিনা পিসির

জীবন-সংগ্রাম

সঙ্গে বাবাকে দেখতে হাসপাতালে যেতুম ! এই ডাক্তার বাবাকে রোজ এসে দেখতো ! আমাকে অনেকদিন বলেছে, খোকা তোমার নাম কি ? তোমাদের বাড়ী নিয়ে যাবে আমাকে ? আমি কিছু বলিনি ! আমার মিনা পিসিও ঐ ডাক্তারকে খুব ভালোবাসে ! মাকে ওঁর সম্বন্ধে কত কথা বলে ! ঠ্যা দিদিমা উনি নাকি খুব বড় ডাক্তার ?”

অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে লতিকা বলেন—“এসো—দোতলার গাড়াবারান্দায়। ফোয়ারা দেখেছো ?” কথাটা বুঝতে না পেরে অরুণ দিদিমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে বারান্দার রেলিংয়ের কাছে এসে দাঁড়ায়।

দোতলা থেকে অদূরে, নীচের শ্যামল দুর্বাদল আচ্ছাদিত টেনিস্ গ্রাউণ্ডটার পাশের একটা তাবের জালে ঘেরা, কৃত্রিম উঁচু-নীচু পাহাড়ের প্রাচীরে বাঁধানো, ছোট জলাশয়ের ভেতরে ঝরণা দেখিয়ে, লতিকা বলেন—“ঐ দেখছো ফোয়ারা ? কেমন ফুলে ফুলে জল উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে ?”

বিষণ্ন হতভম্ব অরুণ, সেইদিকে চেয়ে অস্ফুটে বলে উঠলো— “ভারি সুন্দর তো !” তারপর সে তার দিদিমার দিকে চেয়ে বললো, “অতো জল কোথা থেকে উঠে ছড়িয়ে পড়ছে দিদিমা ?” তারপর সেই ফোয়ারাটার কাছাকাছি রেলিংয়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে খানিকক্ষণ উকীঝুঁকি মেরে, খুব হেসে উঠে অরুণ বলে,—“দেখেছো দিদিমা,—ক’ত রকমের সব পাখি ঐ বালির ধারের পাথরগুলোর ওপর বসে রয়েছে ?”

জীবন-সংগ্রাম

তারপর আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে সে বলে হঠে,—“ঐ ছোটো বুঝি ময়ূর—না দিদিমা? কি খাচ্ছে ওরা সব খুঁটে খুঁটে? ওর ভেতরে ঢুকতে প'রা যায়না দিদিমা? অতবড় জায়গাটা তারের জাল দিয়ে ঘিরে রেখেছে কেন দিদিমা? পাখিগুলো নইলে সব পালিয়ে যাবে বুঝি?” তারপর লতীকাদেবীর হাতটা ধরে টেনে, জালে ঘেরা সেই হ্রদের পাশের টেনিস্ গ্রাউণ্ডটা দেখিয়ে অরুণ বলে,—“এখানে বুঝি ফুটবল খেলা যায়? এখানে কারা ফুটবল খেলে দিদিমা? আমায় খেলতে দেবে?”

—“এ সবই তো তোমার। ঐ সব পাখি, ঐ ময়ূর,— ঐ ফোয়ারা, এই বাড়ী, এ সবই তো তোমায় দিয়ে দেবো। এসো এখন স্নান খাওয়া করে, দাহুর সঙ্গে গল্প করবে চ'ল। তারপর বিকেল হ'লে, মোটর গাড়ীতে করে তোমাকে তোমার মা বাবার কাছে পাঠিয়ে দেবো। তখন তুমি সেই গাড়ীতে করে তোমার মা, বাবা, মামা, আর তোমার মিনা পিসিকে নিয়ে আসতে পারবে তো?” এই বলে অরুণকে কোলে তুলেই তার গায়ে একটা চুমো খেয়ে, লতীকাদেবী হাসি মুখে তার দিকে চেয়ে রইলেন! আশার আনন্দে আত্মহারা, বালক অরুণ তখন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে, মাথাটা তাঁর কাঁধের পাশে হেলিয়ে, দুহাতে গলাটা জড়িয়ে ধরে, দিদিমার কোলের ওপরে পা দোলাতে শুরু করলো। তারপর নাতির সঙ্গে দিদিমায়ের সেকি আলাপের ঘটনা!

জীবন-সংগ্রাম

ছপুরের বিশ্বাসের পর আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে সরোজবাবু তাঁর স্ত্রীকে বললেন—“কাজটা ভাল হয়নি লতু, রেবতীর সঙ্গেই খোকাকে পাঠিয়ে দেয়া উচিত ছিল। বিলাস নাকি রেবতীর মুখে, খোকাকে এখানে নিয়ে আসার কথা শুনে খুব রাগ করেছে! মাধবীও খবরটা শুনে মোটেই খুশী হয়নি! ওদের কাছে না বলে, অমনি করে খোকাকে নিয়ে আসা তোমার উচিত হয় নি!”

স্তুম্ভিত বিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে, লতিকাদেবী বললেন,—“কি করে জানলে? রেবতী টেলিফোন করেছিলেন বুঝি?”

—“হ্যাঁ এহতে একটু আগেই টেলিফোন করেছিলো রেবতী—বিলাসের অফিস থেকে!”

—“কিসের অফিস করেছে বিলাস?”

—“সংবাদ পত্রের অফিস! ‘দেশবাসী’ বলে একটা নতুন দৈনিক বেরিয়েছে না?—বিলাস সেই কাগজের সম্পাদক!”

—“‘দেশবাসী’—কাগজটা বুঝি বিলাসই চালাচ্ছে? কিন্তু অত টাকা ও কোথায় পেলে?”

—“টাকা ওর নয়, সম্পাদক হিসেবে ও শুধু সেখানে চাকরি করছে! চাকরিটা নাকি হাল পেয়েছে; মাইনেও গুননুম বেশ মোটা টাকাই পাচ্ছে!”

সরোজবাবুর কথা শুনে সহসা যেন একটা মুক্তির নিশ্বাস মোচন করে বাঁচলেন লতিকাদেবী। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে

জীবন-সংগ্রাম

শেষে তিনি স্বামীকে প্রশ্ন করলেন,—“তাহলে খোকাকে তো আজই পাঠানো উচিত দেখছি! তুমি নিয়ে গিয়ে দিয়ে আসবে? নাকি আমিই গাড়ী করে ওকে নিয়ে যাবো? ওদের বাসার ঠিকানাটা রেবতীবাবু কাছে জেনে নিয়েছ তো?”

একটা বুক ফাঁটা নিশ্বাসের ভেতর থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে,—সরোজবাবু বললেন,—“আমাদের কাউকেই যেতে হবে না। রেবতী টেলিফোনে জানিয়েছে, মাধবীর ভাড়াটে বাসার বাড়ীওয়ালার বোন—মিনা, না কি যেন একটা নাম, সেই তার দাদার গাড়ী নিয়ে খোকাকে বিকেলে নিতে আসবে!”

“শুন্‌হিলুম বটে খোকার মুখে মেয়েটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা,—ওকে বোধহয় খুব ভালবাসে মেয়েটি! ক্ষীরোদের হাসপাতালে লেডি ডাক্তারী পড়েছে বলে বলছিল। ক্ষীরোদকেও নাকি খুব মান্য ভক্তি করে!” বলে স্বামীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে, কোনও উত্তর না পেয়ে, লতিকাদেবী কক্ষান্তরে চলে গেলেন।

সরোজবাবুর কেদারার পাশেই অদূরে একটা ছোট স্প্রিংয়ের খাটে শুয়ে, অরুণ তখন অঘোর ঘুম ঘুমুচ্ছে। তার মাথার পাশে একটা ছোট টেবিল-ফ্যান ঘুরাছিল! সেইদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখলেন সরোজ বাবু। তারপর কি মনে করে, কেদারা থেকে উঠে গিয়ে দেয়াল আলমারীটা খুলে, তার ভেতর থেকে বের করলেন,—একটা

জীবন-সংগ্রাম

ছোট্ট সোণার হাত ঘড়ি, একটা ছোট্ট সোণার ফাউন্টেনপেন,—
আর বের করলেন একটা কারুকার্য খচিত শান্তিনিকেতনি
মানিব্যাগ। তারপর একটা ক্যাশবাক্স খুলে, তার বিভিন্ন
খোপ থেকে বের করলেন, রূপোর কতকগুলো কাঁচা টাকা,
কোনটা থেকে কতকগুলো আধুলী, কোনটা থেকে সিকি
আর আনি। ক্যাশবাক্সের ভেতরের তাক থেকে বের
করলেন একতড়া ছোট-বড় টাকার নোট। শেষে
সেগুলোকে হস্তস্থিত সেই মানিব্যাগটার যথা স্থানে সব ভরে,
আলমারিটা বন্ধ করে,—সেই সব নিয়ে এসে রাখলেন
তার আরাম কেদারার পাশের একটা টিপয়ের ওপরে।
আরাম কেদারায় পুনরায় উপবেশন করে সরোজবাবু মনে
মনে চিন্তা করতে লাগলেন—রেবতীবাবুর কথাগুলো!
টাকাকড়ির ব্যবস্থাটা ধীরেনবাবুর উদ্যোগে হলেও, রেবতীই
প্রকারান্তরে ক্ষীরোর হাসপাতালটা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে!
বিলাসের চাকরীর মূলেও রেবতীর চেষ্টাই কাজ করেছে সব
চাইতে বেশী! যথেষ্ট রেবতী তা যতই অস্বীকার করুক!
ক্ষীরো আর মাধবীকে নিস্বার্থ ভাবেই স্নেহ করে রেবতী।
অথচ জীবন-ভোর তিনি এই রেবতীর সম্বন্ধে কতই না ভুল
ধারণা পোষণ করেছেন মনে মনে! বিলাস নাকি খেতে
পেতনা সেদিনও, টাকা কড়ি আয়ের কোনও ব্যবস্থা করতে না
পেরে ছোকরার মস্তিষ্ক বিকৃতি পর্যন্ত ঘটেছিল; শুধু ধীরেনবাবু
আর তার বোনের চেষ্টাতেই—মাধু, না খেয়ে শুকিয়ে মরবার

জীবন-সংগ্রাম

হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল! কোন বাড়ীওয়ালো এ যুগে এমন হোতে পারে বলে কোথাও শোনেন-নি সরোজবাবু! সহসা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস, তীব্র বেগে বেরিয়ে পড়লো সরোজবাবুর চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা দিয়ে! সোজা হয়ে উঠে বসে আর একবার তিনি চেয়ে দেখলেন অরুণের মুখের দিকে! কতো কথাই না ভাবছেন আজ সরোজবাবু! এই মাধবীর পেটের ছেলে, আজ তারি ঘরে শুয়ে কি সুন্দর নিরুদ্ধে ঘুমচ্ছে! হয়তো একদিন এই ছেলের এক ফোঁটা ছুঁধের ক্ষণ্য কতো হুঁচিছুই না করতে হয়েছে মাধবীকে! অথচ এমনিই অভিমানী মেয়ে, যে—মা-বাপকে তার দুর্দশার কথা ঘুণাঙ্করেও জানায় নি সে কোনোদিন! না না মাধবীর দোষ নেই। তিনি যে তাকে ভৎসনা করেছিলেন! বিলাসের সঙ্গে বিয়ে বসলে তিনি তাকে কোনদিনই বিপদে সাহায্য করবেন না বলে—ভয় দেখিয়েছিলেন যে? সে কথা মাধবী তার ঘোরতর দুর্দিনেও ভুলতে পারেনি? বাপকে মাধু সত্যিই বড় জব্দ করেছে! বাপ-মায়ের জেদ আর অহঙ্কারকে ক্ষীরোদ আর মাধবী সত্যিই বুদ্ধান্তর্গত দেখিয়েছে! অথচ তিনি যে তাদের কতো ভালবাসেন সে কথা তাঁর চাইতে কে আর বেশী জানে? সহসা তাঁর চোখের কোণে দু'ফোঁটা অশ্রু টলমল করে উঠলো! না-না ক্ষীরোদ আর মাধবী চিরজীবনের মতোই পিতা-মাতাকে বর্জন করেছে! চোখের জলে সরোজবাবুর সম্মুখের দৃষ্টি ন্যাপসা হয়ে এলো।

জীবন-সংগ্রাম

কোঁচার কাপড় দিয়ে তিনি চোখের কোণ মুছতে লাগলেন ! আজ তাঁর যত লজ্জা আর যত দুশ্চিন্তা শুধু লতিকাকে নিয়ে ! লতুর হয়তো অনেক সময় অনেক কিছুই ছেলেমেয়েদের জ্ঞান করবার ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু সত্যিই কি তিনি শুনেছেন কোনদিন তাঁর কথা ? না না তিনিই অপবাধী ! তিনিই এ সংসারের যত অনাসৃষ্টির মূল ! নিস্পন্দ ধীরেনবাবু তাঁরই ছেলে মেয়েকে ভীষনে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে, নিজের স্ত্রীটিকে পর্যন্ত হারাতে বাসেছেন । ধীরেনবাবুর স্ত্রী আজ উন্মাদ-পাগল ! ক্ষীরোদের হাসপাতালে আজ তাঁর জীবন কাটাচ্ছে ! অথচ সরোজ বাবু তো অতি সহজেই তাঁর ক্ষীরো আর মাধবীকে পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারতেন ? না-না, আর ভেবে লাভ নেই ! টিল এখন হাতের বাহরে চলে গেছে ! কাকুতি মিনতি করলেও ক্ষীরো আর মাধবী এ জীবনে তাঁর কাছে ফিরে আসবে না ! কাপড়ের কোঁচা তুলে তিনি আবার চোখ মুছলেন ।

হাতের একটা রঙিন খলেতে ভরে, ফ'ল আর কিছু মিষ্টি নিয়ে এ ঘরে ঢুকেই, স্বামীর চোখে জল দেখে, লতিকা-দেবী সহসা অপরিসীম বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়ালেন ! শেষে পাশের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বাসে পড়লেন ।

সরোজবাবু বললেন, “খোকার সঙ্গে এগুলো পাঠিয়ে দেবার জ্ঞান এনেছা তো ? এগুলোও দিয়ে দিও খোকাকে সেই সঙ্গে,—” বলেই তিনি টিপয়স্থিত রিষ্টেওয়াচ, ফাউন্টেনপেন আর মানিব্যাগটার দিকে স্ত্রীকে দেখিয়ে দিলেন !

জীবন-সংগ্রাম

স্বামীর এই বিপরীত ভাব বৈচিত্রে, মনে মনে যুদ্ধ এবং আনন্দিত হয়ে, লতিকাদেবী প্রশ্ন করলেন,—“কি ভাবছিলে তুমি অমন করে ? একটু হরলিক্‌স্‌ দিতে বলবো মেয়েকে ?”

দূরের দিকে চেয়ে উদাস গস্তীরভাবে সরোজবাবু বললেন,—“তা—বলে দাও ; কিন্তু খোকাকে কি ঘুম থেকে তুলবে না তুমি ? দু’টো কথাও যে বলা হোলো না ওর সঙ্গে ।” কি যেন ভাবলেন সরোজবাবু । তারপর শেষে বললেন,—“আবার তো একটু পরেই এসে ওরা খোকাকে নিয়ে যাবে, তিনটে তো প্রায় বাজে !” বলেই একটা নিশ্বাস মোচন করলেন তিনি ।

লতিকাদেবী স্বামীর পাশে এগিয়ে গিয়ে সহানুভূতির সুরে, তাঁর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন,—“নিয়ে গে’লই বা খোকাকে আজ ; আবার তো ওরা আসবে । আমি তার ব্যবস্থা করেছি ! মিনা মেয়েটি নাকি খুব ভালো, সেই তো আসবে এখানে খোকাকে নিতে ? আমি সব জেনে বুঝে নিয়ে, একটা ব্যবস্থা করে ফেলছি ওদের এখানে নিয়ে আসবার জন্য । তুমি কিচ্ছু ভেব না ?”

উপেক্ষার হাসি হেসে সরোজবাবু বোললেন,—“না লতু ওরা আর আসবে না,—আসতে পারেনা !” কিন্তু কেন যে আসতে পারেনা সে কথার কিছুই তিনি স্ত্রীকে ভেঙ্গে বললেন না । সরোজবাবুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো । উদ্বেলিত মন তাঁর তখন রীতিমতো বিচলিত হয়ে উঠেছে ।

জীবন-সংগ্রাম

তার মনের সেই গভীর ব্যাকুলতা চেষ্টা করেও আর তিনি
স্বীর কাছে লুকোতে পারলেন না।

সতরো

মিনতীকে দেখে হাসপাতাল থেকে ফেরবার মুখে, সেদিন
বিকলে কি একটা কথা জিজ্ঞেস করবার জন্য ধীরেনবাবু
ক্ষীরোদ ডাক্তারের চেম্বারের সুইচ ডোরে ধাক্কা দিয়েই কেমন
যেন অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সেই চেম্বারে একলা বসে
সুপ্রিয়া তখন কি যেন লিখছিল তার ফাউন্টেনপেন দিয়ে
একাগ্র চিত্তে। সুইচ ডোরের ধীরেনবাবুর হাত পড়তেই, কোনও
আগন্তুক মনে করে, সুপ্রিয়া ভেতর থেকে পরদা ঠেলে বাইরে
বেরিয়ে এলো।

বাড়ী চলে যাবেন, কিম্বা ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করবেন,
ভাবতে না ভাবতেই, সম্মুখে সুপ্রিয়ার আবির্ভাব দেখে,
রীতিমতো মুস্কিলেই পড়লেন ধীরেনবাবু। অপ্রস্তুত হতে হোলো
সুপ্রিয়াকেও।

সেদিন মিটিং-এ ধীরেনবাবুকে দেখবার পর থেকেই, ভুল
হচ্ছিল তার হাসপাতালের প্রত্যেক কাজেই। কোশলে মিনার
কাছে সম্পূর্ণ পরিচয় নিয়ে ইতিপূর্বেই ধীরেনবাবু সম্বন্ধে
নিঃসংশয় হয়েছিল সুপ্রিয়া। তাতেই নিজেকে লুকিয়ে রাখবার

জীবন-সংগ্রাম

চেষ্টি সে কম করেনি। কিন্তু সেই চেষ্টি যে এত শীগ্গিরই এমনি করে তার ব্যর্থ হয়ে যাবে, এতটা সে কল্পনাও করেনি। অনেক দিনের অনেক পুরনো কথা তখন সুপ্রিয়াব মনে একটির পর একটি করে ভেসে উঠছিল।

ধীরেনবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ যে, সে কিসের চিন্তায় মসৃণল হয়েছিল, তা তার মনে নেই—। এক সময়ে সুপ্রিয়ানু সেই ভাবাবেগ সহসা হ্রিন্-ভিন্ন হয়ে যেতেই সে ধীরেনবাবুর দিকে মুখ তুলে চাইল।

সুপ্রিয়ার সেই অবস্থা দেখে ধীরেনবাবুর মনেও কোন অতীত চিন্তার আবির্ভাব হয়েছিল কিনা জানি না। তিনিও তার দিকে বার কয়েক চেয়ে দেখলেন, এবং শেষে তাকে শুধু প্রশ্ন করলেন—
“ক্ষীরোদ বাবু হাসপাতালে নেই বুঝি? কোথায় বেরিয়েছেন?”

প্রশ্ন শুনে—সুপ্রিয়ার বুক ফেটে কান্না আসতে চায়। হায়রে। মানুষের মন! একদিন যাকে না হলে তার মোটেই চলতো না; কতো চিঠি, কতোই না আন্তরীকতার মর্মস্পর্শী আবেদন নিবেদনের ঘটা! আর তারি পরিণাম বুঝি এই! এতদিনের এতো পরিচয়ের যোগসূত্র কি এমনি করেই মানুষের ছিঁড়ে যায়? মুখ দিয়ে একটা ভদ্রতামূলক কৃশল জিজ্ঞাসার কথাও কি প্রথমে বেরুলো না? আজও সুপ্রিয়া কার স্মৃতি নিয়ে তবে জগতে বেঁচে রয়েছে? নিজেকে মনে মনে সহস্র বার ধিক্কার দিয়ে, একটা যুক্তিব নিশ্বাস মোচন করে যেন বাঁচলো সুপ্রিয়া।

জীবন-সংগ্রাম

ধীরেন বাবু তার বিগ্ৰহ মুখ দেখে বললেন—“ভেবেছি জীবনে আমিও অনেক দিন সু, কিন্তু আর কিছুই করা সম্ভব হয় নি ! তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো —।” তারপর বললেন— “ডাক্তার ঞ্চল শুধু বলা, আমি তাঁর খোঁজ করেছিলাম ।” বলেই ধীরেনবাবু স্থান পরিত্যাগ করবার জন্য পা বাড়ালেন ।

অভিমানের অশ্রুজলে সুপ্রিয়ার ছুঁনয়ন তখন টলমল করছে । কি যেন বলবার জন্য সহসা তার ঠোঁট দুখানা একবার কেঁপে উঠলো । ধীরেন বাবু সেটা লক্ষ্য করে আবার খেমে দাঁড়ালেন ! তাঁকে খামতে দেখে, ধরা গলায় সুপ্রিয়া বলে উঠলো—“আমি তো সে জন্য কোনােদন তোমায় কিছু বলিনি । আমাকে আর অযথা অপরাধা করে তোমায় লাভ কি ?” তারপর বলে, “কাজের যদি কিছু তাড়া না থাকে চ’ল-না ভেতরে বসবে একটু ! এখানে এ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা...” বলতে বলতেই সুপ্রিয়া চেয়ারের ভেতরে ঢুকে হাতের রুমাল দিয়ে নিজের চোখ দুটো খুব ভাল করে মুছলো । পেছনে পেছনে চেয়ারের ভেতরে প্রবেশ করেই, ধীরেন বাবু সুপ্রিয়াকে বললেন—“আজও তোমাকে আমি ভুলতে পারিনি । সে কথা কি বিশ্বাস করবে সু ? যৌবনের শেষ কোঠায় পা দিয়ে আজ শুধু এই নিভতেই তোমাকে বলা যায়—আজো আমি তোমায় ভালবাসি ! এখানে তুমি কবে এসেছ, কি করছো ;—তার বিন্দু বিশ্বর্গও আমি জানিনা ! কিন্তু তবুও, এই জীবনের মধ্যাহ্নে আজ

জীবন-সংগ্রাম

যদি একটা শেষ অনুরোধ তোমায় করি ?—তা হলে সেটা কি, অস্তুতঃ পরিচিত বলেও রক্ষা করবে ?”

হর্ষ-বিষাদে সুপ্রিয়ার মন তখন উৎক্লিষ্ট বিক্লিষ্ট দোল খাচ্ছিল ! ধীরেন বাবুর কথার উত্তর দিতে গিয়ে, সে বলে বসলো—“আমায় নিয়ে একবার নতুন করে সংসারী হতে চাও, এইতো ?”

সহসা দাঁতে জিভ কেটে ধীরেন বাবু বললেন,—“না সুপ্রিয়া সে ছঃসাহস আমার নেই ! আমি তোমাকে চাকরীর পরাধীনতা থেকে অব্যাহতি দিতে চাই । আমি জানি কাজ ছাড়া তুমি বাঁচতে পারবে না, কিন্তু স্বাধীন ভাবেও তোমাকে কাজে তুমি করতে পারো ? সেজন্য যা টাকা লাগবে সেটা আমিই সব ব্যবস্থা করে দেবো ।”

সহসা খিল খিল করে হেসে উঠে সুপ্রিয়া বলে—“মেয়ে-মানুষ কাবো অবলম্বন ছাড়া জগতে কোথাও কোন বৃহৎ কাজের প্রতিষ্ঠা করে কৃতকার্য হয়েছে বলে শুনেছো ? টাকায় আমার প্রয়োজন কি ? শুধু নিজের জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাই নিয়েই তো আমি আজও ব্যস্ত রয়েছি ! তুমি তো জানো বাবার মৃত্যুর পর থেকে জগতে আমার আব কোন অবলম্বনই নেই । পৈত্রিক সম্পত্তি যেটুকু ছিল সেটুকুও আমার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়কে বিলিয়ে দিয়ে, চাকরী করে করেই তো জীবনের দিনগুলি প্রায় কাটিয়ে এনেছি ! এখন আর কার জন্য, কিসের আশায় ?—জীবনের এই বয়সে অযথা তোমার

জীবন-সংগ্রাম

কতগুলো টাকা নষ্ট করে, কলঙ্কের বোঝা ভারি করে তুলবো ?”

“কলঙ্ক ?—তা হবেও বা ! কিন্তু আমার কাছে চিরকালই তুমি থাকবে. অকলঙ্ক,—তেমনি উজ্জল ! তোমার সম্বন্ধে কারো কাছেই আমার নালিশ করবার কিছু নেই ! কিন্তু এমন করে আজ আমায় উপেক্ষা করলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি হবে হবে সু ?”

“তুমি ভুল বুঝো না ! উপেক্ষা তোমায় আমি এতটুকুও করিনি। আজ এই যৌবনের চরম প্রান্তে পৌঁছে, অথবা তোমাকে ব্যতিব্যস্ত করে আমার লাভ কি ? পৃথিবীতে কেউ নেই আমার ! যৌবনের গোড়ায় হয়তো তোমায় ভাল বেসেছিলাম,—কিন্তু তারপর তুমি সংসারী হয়েছা,—আমি অক্ষম তাই আর কাউকেই ভালবাসতে না পেরে, সেবাব্রত গ্রহণ করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি ! বেশ রয়েছি আমি। তুমিও তো অসুখী নও। কিসের দুঃখ তোমার ? জন্মান্তরের অভিশাপ আমাকে সারাটা জীবনই তো প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে মারছে ; আমার জন্য তোমাকে আর কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না !”

উন্মুক্ত বাতায়ন পথে, দূরের দিকে দৃষ্টি হারিয়ে ধীরেনবাবু বেদনার হাসি হেসে বললেন—“বাহ্যিক দুঃখ, অভাব, অভিযোগ আমার পূর্বেও ছিল না, এখনো নেই ! হয়তো সেইটেই আমার জীবনের চরম অভিশাপ ! আজ যৌবনের শেষ কোঠায় পা দিয়ে, কেবলি কি মনে হচ্ছে জানো ? আমি যদি সত্যিকারের

জীবন-সংগ্রাম

একজন দরিদ্র হতাম ? যদি উদয়াস্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেল খেটে মরতে হোত আমাকে, তাহলে হয়তো তোমাকে পেতাম । তাতে যদি হুঃখ্য আমার বেড়েও উঠতো—তা হলেও বোধহয় আজ আমাকে এতবড় অশান্তির বোঝা বয়ে বেড়াতে হোত না !”

“এটা শুধু তোমার কল্পনার কথা ! এভাবে তুমি নিজেকেই প্রত্যাড়িত করতে পারবে, কিন্তু এ বিশ্বের একটি প্রাণীও তোমার এই বেদনায় সহানুভূতি করবে না । এ কথা অবশ্য আজ তোমাকে বলবার আমার কোন অধীকারই নেই ; কিন্তু একদিনও তোমার সঙ্গে আমার যেটুকু পরিচয় হয়েছিল তাকেই উপলক্ষ করে, বোধহয় আজ বলতে পারি, এ জগতে, ভাল তুমি কাউকেই বাসোনি । তা যদি বাসতে, তাহলে উচ্ছ্বসিত যৌবনের গোড়া থেকে ভীকৃতাকে নিজের মনে প্রশ্রয় দিতে না । আজ তুমি আমাকে যা বোলতে চাচ্ছ, সেটা হচ্ছে তোমার ভীক জীবনের অকরণ ক্রন্দন ।”

কথা শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে বাবুর মুখখানি ম্লানমায় অচ্ছন্ন হয়ে উঠছিল । তিনি উঠে দাঁড়িয়ে শুধু বললেন—“যাক । এর পর আর তোমাকে আমার বলবার কিছু নেই ! শান্তি চাও তো আমাকে ভুলতে চেষ্টা কোরো ।” বলেই তিনি উদ্ভ্রান্তের মতো চেম্বার থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন ! সেইদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে অনুভূতির একটা তীব্র কশাঘাতে সুপ্রিয়ার চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো !

জীবন-সংগ্রাম

ধীরেন বাবু যখন বাড়ীতে ফিরলেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠবার পথে তিনি দোতলার বিলাসের বৈঠখানার দিকে চাইতেই দেখলেন, রেবতীবাবু, বিলাস আর মাধবীর সঙ্গে গল্প করছে। সেদিকে ক্রক্ষেপ না করে ধীর পদক্ষেপে উপরে নিজের কক্ষে প্রবেশ করে তিনি ইঞ্জিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। মনে তার আজ কিছুই আর ভালো লাগছিল না! সহসা ইঞ্জিচেয়ার থেকে উঠে গিয়ে তিনি তার তেতলার বারান্দায় পাইচারী শুরু করলেন। সুপ্রিয়ার শেষ কথা কয়টা পাক খেয়ে খেয়ে তখনো তার মনের ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সুপ্রিয়া আজ তাঁকে যে চরম শিক্ষা দিয়েছে তা তিনি নানা ভাবে নানাদিক থেকে চিন্তা করে দেখে, মনে মনেই অনুশোচনায় পুড়তে লাগলেন। সুপ্রিয়া সম্বন্ধে তাঁর মনের কোণে যে বাসনাটা এতদিন ভবিষ্যতের সোনার স্বপ্ন রচনা করে বেড়াত : সে যেন অতি অকস্মাৎ আজ তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। সুপ্রিয়ার কাছ থেকে বিদায় নেবার পর ধীরেন বাবু ভাবছিলেন,—হায়রে কল্পনা আব অন্ধ ভবিষ্যৎ! তোমরা এতই নিষ্ঠুর এমনিই বিশ্বাস স্বাতক? ধীরেন বাবু বুঝলেন, অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ এদের কারোই কে ন অস্তিত্ব নেই এ জীবনে। বেঁচে থাকে শুধু মানুষের নেশা আর চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় তাকে তার অন্ধ ভবিষ্যতের আশা। এই তো মানুষের যোগ্যতা! আজ যাকে সে আগ্রহে বুকে তুলে নিলো, কালকেই আবার কোনও অসতর্ক

জীবন-সংগ্রাম

যুহুর্ষে পথিপার্শ্বে তাকেই সে ফেলে চলে যায়। মহৎ চিন্তার দ্বারা নিজের ব্যক্তিত্বকে পরিমার্জিত করতে না পারা পর্যন্ত, মনুষ্যত্বের কোন অস্তিত্বই এ জগতে স্থায়ী হয় না। ভাল, মন্দ, সুন্দর, কুৎসিত, সৎ, অসৎ, এ সবই বিভিন্ন মানুষের জ্ঞান এবং ক্রটিভেদের মাপকাঠিতেই বিচার হয়ে থাকে। সে দিক থেকে দেখলে, মিনতী, সুপ্রিয়া, কিম্বা মাধবী, প্রত্যেকেই ভিন্ন ভাবে বিচার করা চলে। কিন্তু আসলে তারা এক জায়গায় সবাই যে এক এইটুকুই ধীরেন বাবু শেষ পর্যন্ত বুঝে দেখলেন।

—“শুনছো দাদা, সরোজ বাবু মরণাপন্ন কাতর।” চিন্তার খেই হারিয়ে সহসা বোনের কথার উত্তরে ধীরেন বাবু বললেন—
“কি অসুখ হয়েছে তাঁর ?”

—“পাঁচ-টা মেশানো রোগ। বুড়াদের যেমন হয়। একবার দেখেই এসো না। প্রায়ই তোমার নাম করেন।”

চিন্তাশ্রিত ভাবে ধীরেন বাবু বললেন—“কৈ আমাকে তো কেউ বলেনি সে কথা ?” তারপর একটু ভেবে বললেন, “দেখবো যদি কাল যেতে পারি। কিন্তু তোমায় তো বুড়াবুড়ি দুজনেই খুব ভালবাসেন—তা তুমি কে’ন ইতিমধ্যে একবার গিয়ে দেখা করে এসো না ?”

“বা-রে ! হাসপাতালের তরফ থেকে আমি তো প্রায়ই যাচ্ছি ! নইলে জানলুম কি করে ? কিন্তু গিয়ে এমন লজ্জায় পড়ি যে-তা আর বললে ফুরায় না। কেবলি বুড়া, তার ছেলে মেয়েকে এনে দেবার জন্তু আমায় অনুরোধ করবে।

জীবন-সংগ্রাম

কি করি বল দেখি ? মা-মা-কবে একেবারে পাগল করে মারে যে'ন বুড়িটা ।

“কেন ?—তোমার বৌদি, বিলাস বাবু, ডাক্তার চৌধুরী, এঁরা যাবেন না তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ? এখন এতদিনে এঁদের তো বুড়োবুড়ির ওপরে কোনও অভিমান থাকা উচিত নয় ?”

‘সে কথা কে আর কাকে বলবে ? মাধবী বউদিকে কিছু বললেই সে কাঁদতে থাকে । অরুণ বেচাবীকে, সেই যে নিয়ে এসেছি তার পব থেকেই লুকিয়ে লুকিয়ে রোজ এসে আমার কাছে কাঁদে আর বলে, ‘একবারটি নিয়ে চলো না পিসি আমাকে আমার দাছ আর দিদিমার কাছে ! আমায় তাঁরা কতো ভালবাসেন,—কিন্তু বাবা কেন ওঁদের কথা শুনলেই চটে যান পিসি ? ওঁরা ক’ত ডাকছে আমাকে তুমি তো জানোনা ? তবুও কে’ন আমাকে যেতে দিতে চান না বাবা-মা ?’ ছেলের কথা শুনলে আমার বড্ড কান্না পায় । নিয়ে যেতে পারি না ওর ম’ বাবার জন্ম, অথচ কি আমি কাকে বলবো বলতো ?’ তাবপর একটু ভেবে মিনা বলে “আচ্ছা দাদা, তুমি একবার ডাক্তার চৌধুরীকে বুঝিয়ে বলতে পার না ? উনি একবার গেলে হয়তো বুড়োবুড়ি ছুজেনই অনেকটা আশ্বস্ত হবে ! বলবে তুমি একবার ডাক্তার চৌধুরীকে ?”

“দেখবো আমি একবার চেষ্টা কবে, কিন্তু ব্যাপারটাতে কিছুই তুমি বুঝতে পাচ্ছ না কি না ? সেই তো মুশ্কিল ! পরের

জীবন-সংগ্রাম

কোনও সাংসারিক ব্যাপারে মাথা গলাতে যাওয়াটা তো ভাল কথা নয় ! কাজটা হচ্ছে কোনও নিকট আত্মীয়ের । কিন্তু সরোজ বাবু কোন দিনই তার কোন আত্মীয় স্বজনকে গ্রাহ্য করেন নি । লক্ষ্মীর 'ধর লাভ করে অপরিযাপ্ত ধনের অধিকারী হয়ে, তিনি পৃথিবীতে জন্মে অবধি শুধু নিজের অর্থ আর সামর্থেরি পূজা করে এসেছেন । আজ বার্লিনের শেষ কোঠায় দাঁড়িয়ে তিনি তার গত জীবনেব ভুলের বিভীষিকা দেখছেন ! সেই অনুশোচনাই হয়তো তাঁকে মৃত্যুর তীরে ঠেলে নিয়ে যাবে শেষ পর্য্যন্ত ।”

মিনা বলে,—“না না ! বুড়ো সহজে মরবে না দাদা, তুমি দেখে নিও ! বিলাসদার কথা অবশ্য আমি বলতে পারিনে, কিন্তু ঐ মাধবী বৌদি আর ডাক্তার চৌধুরীর মুখ দর্শন না করা পর্য্যন্ত বুড়ো মরতেই পারে না । তোমায় বললে বিশ্বাস করবে না দাদা—একটা ছোট ছেলে যেমন তার একটা হারানো প্রিয় বস্তুর খোঁজে আহার নিদ্রা ভুলে, তাকে কেঁদে কেঁদে খুঁজে বেড়ায়,—ছেলে মেয়ের জন্ম বুড়োবুড়ির ঠিক সেই অবস্থা হয়েছে ।”

যুচ্‌কি হেসে ধীরেন বাবু বললেন—“তা মন্দ কি ? বেড়াবার নাম করে মোটরে তুলে একদিন নিয়েই যাওয়া সেখানে তোমার বউদি আর তার ছেলেকে ! হাজার হোক বুড়ো মানুষ তো ? তোমার বউদির কিছু লাভ হোক কি না হোক, তোমার তো কিছু লাভ হতে পারে ?”

জীবন-সংগ্রাম

উচ্ছ্বসিত আনন্দে আত্মহারা হয়ে মিনা উত্তর দেয়,—
“তা হবে বই কি ? তোমায় যখন বলেছে ! সম্পত্তির অর্ধেকটাই
শেষ পর্যন্ত আমার নামে লিখে দেবে বুঝি ?”

মহা বিস্ময়ে মত মিনার দিকে টানা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে,
ধীরেন বাবু বললেন—“উড়িয়ে দেবার কথা আমি একটিও
বলুছি না কিন্তু ! বুড়ার ছেলে একজন কতবড় ডাক্তার তা
জানতো ? তুমিও আবার তাবি কলেজের একজন লেডি
ডাক্তার হয়ে উঠছো, তা ছাড়া বুড়াবুড়ি তো তোমাকে রীতিমত
ভালবেসেই ফেলেছে । সেই তোমার চেষ্ঠায়,—বুড়াবুড়ি যদি
শেষ জীবনে তাঁদের ছেলে মেয়ের মুখ দেখতে পায়, সেটা
কি বড় সোজা লাভের কথা ? সেখানে সম্পত্তি তো কোন্
ছাড়,—আরো কতো কিছু তোমায় দিয়ে দিতে পারে, তা তো
আর ভেবে দেখান ?”

“বুড়াবুড়ি আমাদের ভালবেসে ফেলেছে না ছাই করেছে ।
ষয়ে গেছে তাদের আমাদের ভাল বাসতে ! আমি কি তাদের
মাধবী না ক্ষীরোদ ?” বলেই সহসা অশ্রুদিকে মুখটা ফিরিয়ে,
দাঁতে জীব কেটে নিয়ে, ধীরেন বাবুর দিকে চেয়ে আবার মিনা
বলে,—“পয়সাওয়ালী ভদ্রলোকেরা কার্যোদ্ধারের জন্য অমন
ভালবাসার ভান অনেককেই দেখায় !—সম্পত্তি না হাত
দেবে আমাদের ! সেই হাতীতে চড়ে তুমিই গিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ
করে এসো ! আমি চললুম,—আজ আবার হাসপাতালে ডিউটি
রয়েছে ।

জীবন-সংগ্রাম

মিনা চলে যাবার কয়েক মুহূর্ত পরেই রেবতী বাবু, পরদা ঠেলে ধীরেনবাবুর কক্ষে প্রবেশ করলেন। দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা করেই ধীরেন বাবু প্রশ্ন করলেন—“আপনাকে বড্ড শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে যেন ? কিছু অসুখ করে ন তো ?”

এক গাল হাসি হেসে রেবতী বাবু বললেন—“শরীর থাকলে রোগ হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি ! কিন্তু আপনার স্ত্রী কেমন আছেন ?”

“—আজ বিকেলে যা দেখে এলুম তাতে অনেকটা সুস্থ বলেই মনে হল। তবে, ডাক্তার পাল বললেন,—পুরোপুরি সুস্থ হ’তে এখনো পাঁচ সপ্তাহ সময় নেবে। তিনি তো আমাকে ভরসার কথাই বললেন।”

দূরের দিকে ক্লান্ত বিষন্ন দৃষ্টি মেলে রেবতীবাবু বললেন,—“ভালো যে উনি হবেন এ ব্যাভাতো আমি ডাক্তার না হয়েও জোর করে বোলতে পারি। স্নায়ুশূল রোগটাই হচ্ছে ওঁর প্রধান অসুখ, সেকথা ইতিপূর্বেই ক্ষীরোদের কাছে আমি শুনেছিলাম। আর যা সব বাড়াবাড়ি দেখেছেন তা ঐ রোগের লক্ষণ বৈচিত্র্য। ওঁর রোগ মুক্তি সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতই রয়েছি কিন্তু মুস্কিলে পড়েছি ক্ষীরোদের বাবাকে নিয়ে।”

“—মিনাও একটু পূর্বেই বলছিল বটে তাঁর কথা।” বলেই ধীরেন বাবু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। রেবতীবাবু বললেন—“আমি বুঝতেই পাচ্ছি না—সরোজ হঠাৎ ছেলে-মেয়ে ছেলেমেয়ে করে এমন পাগল হয়ে উঠলো কেন ? সেদিন

জীবন-সংগ্রাম

মিটিংয়ের শেষে অরুণকে নিয়ে যাবার পর থেকেই দেখছি সরোজের চরিত্রে এক অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে। অরুণ চলে আসবার দিন তিনেক পর থেকে, সরোজ পুরোপুরি শয্যা গ্রহণ করেছে। •সেই কথাই বলছিলুম বিলাস আর মাধবীকে। বল্লুম তো ছেলেটাকে নিয়ে যাবার জন্তু মাধবীকে অনেক করে। কি করবে তা ওরাই জানে!” তারপর একটু চিন্তা করে বললেন,—“সময় করে আপনিও কাল পরশু একদিন গিয়ে দেখে আসুন না? আমাকে বলছিল কালকেও। বোধহয় কিছু দরকার আছে আপনাকে।”

—“বেশ তো, বলবেন সরোজ বাবুকে,—যদি পারি তো কালকেই আমি দেখা করে আসবো।”

---“আচ্ছা তা হলে আমি উঠছি, রাত্রিও অনেক হোল; এর পর আবার সরোজের ওখানে যেতে হবে। আজই বলবো আমি সরোজকে আপনার কথা।” বলতে বলতে তিনি নমস্কার জানিয়ে উঠে পড়লেন।

আঠারো

গত কয়দিন থেকেই সরোজ চৌধুরীর রোগ একটা অদ্ভুত পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। সহরের বড় ডাক্তার কবিরাজ কাউকেই ডাকতে লতিকা ক্রোটা করেন নি! কিন্তু কি যে তাঁর রোগ তা সঠিক কেউ ধরতে পারছে না। অথচ দিন দিন যে তিনি দুর্বল হয়ে পড়ছেন, এ-টা কিন্তু প্রত্যেকের নজরেই ধরা

জীবন-সংগ্রাম

পড়ছে। সম্মুখে কাউকে পেলেই তিনি বকতে থাকেন অনর্গল। ডাক্তার, নাস, কিন্মা লতিকা দেবী সে জন্ম তাঁকে কিছু বলতে চেষ্টা করলেই অত্যন্ত মনঃক্ষুব্ধ হন! লতিকা দেবী ধরেই নিয়েছেন স্বামীর এত বয়সের এ রোগ আর স্মরণে না; কিন্তু তবুও তিনি চেষ্টায় কার্পণ্য করেন নি এতটুকুও। চব্বিশ ঘণ্টার জন্ম এ্যাটেণ্ডিং ফিজিশিয়ান্ থেকে শুরু করে পালাক্রমে দু'জন নাস এবং একজন কম্পাউণ্ডারকে বাড়ীর ভেতরেই একটা বড় হল ঘর ছেড়ে দিয়ে রেখেছেন। ফাঁই ফর-মাজ্ খাটবার জন্ম রেখে দিয়েছেন দু'জন ছোকড়া চাকর। আর দিবারাত্রির জন্ম গেটে মোতায়েন রেখেছেন, একখানি ছোট মোটরকার। পরিচিত বন্ধু, বান্দুব এবং আত্মীয় স্বজন, সকলকেই লতিকা সরোজবাবুর অসুখের খবরটা জানিয়ে দিয়েছেন। তার ফলে, সকালে এবং বিকেলে মোটর গাড়ী আর আগন্তুকদের যাতায়াত অনবরতই চলছে।

দোতলার একখানি বিরাট হল ঘরের ভেতরে অসুস্থ সরোজ চৌধুরার শয্যা রচনা করা হয়েছে, এবং ঠিক সেই শয্যাটির অদূরেই একখানি ছোট খাটে, পরিচ্ছন্ন একটি ছোট বিছানা পাতা রয়েছে। আগন্তুকবর্গ বিস্মিত নয়নে শুধু সরোজবাবুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে, তাঁর কথা শুনতে শুনতে, আশ্বে আশ্বেই আবার ফিরে চলে যায়। এত টনটনে জ্ঞানী লোকের রোগটা যে কি হোল, তা কিন্তু কেউ আর বুঝতেই পারে না।

ছোট বিছানাখানির দিকে এক-একবার নজর দিয়ে,

জীবন-সংগ্রাম

আগন্তুকদের দিকে চেয়ে চেয়ে, সরোজবাবু বলেন,—
“লতু বুঝি খবর দিয়েছে? তাই বুঝি আপনারা সব
দেখা করতে এসেছেন? বেশ! বেশ! তা অসময়েই
তো লোক-লোককে দেখতে আসে! আপনারা ভয়
পাবেন না—আমি ঠিক সেরে উঠবো!” তারপর নিজের মনেই
যেন বলতে থাকেন, “একটু পরেই দেখতে পাবেন আমার নাতিটি
এসে ঐ বিছানায় খেলা করবে। ঐ ছেলেটাই দেখছি আমাকে
আর মরতে দেবে না! দাছ দাছ বলে কত কি যে বলে,—বুঝে
উঠতে পারিনে। মুখে যেন খই ফুটছে। ঘুমোবার জো নেই।
ছ’চোখ এক করেছি কি আর অমনি এসে ডাকতে শুরু করবে,
‘দাছ তুমি ঘুমুচ্ছ?’ কি যে চঞ্চল তা আর বলতে পারিনে।”
তারপর তিনি কিছুক্ষণ ছ’চোখ বুজ পড়ে থাকেন।

*

*

*

সেদিন রেবতীবাবু চলে যাবার পর সরোজবাবু একজন
নাসকে দিয়ে লতিকাকে ডেকে পাঠালেন। লতিকা কক্ষে
প্রবেশ করলে নাসকে তিনি সরে যেতে ইঙ্গিত করে স্ত্রীকে
বললেন,—“কৈ ওরা তো এলো না লতু? তোমাব অরুণও
তো কৈ আর এলো না! তোমরা আমায় এমন করে মিথ্যে
আসা কে’ন দিচ্ছ লতু? ওরা আর আসবে না!”

স্বামীর এই শেষ বয়সের, নাতি বাৎসল্যের ব্যথা,
লতিকা যেন আর কিছুতেই সহ্য করতে পাচ্ছেন না! বুকের
ভেতরটা তাঁর ফেটে চৌচির হয়ে যেতে চায়। ‘হায়রে

জীবন-সংগ্রাম

সন্তানের অভিমান। তোরাই শেষ পর্যন্ত বাপটাকে এমনি করে মারবার জন্ত বন্ধপরিষ্কার হয়েছিস?’ কিন্তু মনের সে অবস্থা স্বামীর কাছে তিনি সম্পূর্ণভাবে গোপন ক’রে বলতে শুরু করেন,—“—ওদের যদি ইচ্ছে না-ও থাকে ;—তবুও তোমার ক্ষীরোদ বা মাধবী কাবোই রেবতীবাবুর কথা ফেলবার সাধ্য নেই—তা জানো তো? রেবতীবাবু যখন বলেছেন ওরা আসবেই, তখন তো তোমার উতলা হবার কোন কারণ নেই। খাওয়া-দাওয়া সেরে আসবে তো মাধবী!—বিলাসের অফিস রয়েছে না? ক্ষীরোদের আবার হাসপাতাল। সে তো তার কাজ সেরে চেয়ার থেকেই বেরুতে পারে না বেলা একটার আগে শুনেছি। তা এক্ষুণি আসবে কি করে? তবে অরুণকে নিয়ে, মিনা যাতে আগে চলে আসে, সে জন্ত আমি পূর্বেই ধীরেনবাবুর বাড়ীতে টেলিফোন করেছি।”

“—আহা! বেশ কাজ করেছ’ গো! বড্ড ভালো কাজ করেছ’! ঐ ছুটু সয়তানটার কান ছুটো না মলে দিতে পারা পর্যন্ত আমার আর শাস্তি নেই! এবার আমি একটুখানি ঘুমিয়ে নি তা হলে?”

—“নিশ্চয়! ঘুমুবে বই কি! সারারাত তো শুধু ডাক্তার আর নাসদের সঙ্গে গজর গজর করে মরেছো, এখন একটু ঘুমিয়ে নাও। খোকা এসে পড়লে কি আর তোমাকে ঘুমুতে দেবে?” বলেই তিনি স্বামীর মাথায় হাত বুলোতে শুরু করলেন।

জীবন-সংগ্রাম

ছপুরের পর ক্ষীরোদকে সঙ্গে নিয়ে সরোজবাবুর কক্ষ প্রবেশ করে, রেবতীবাবু একটা চেয়ার টেনে তাঁর শয্যার সম্মুখে বসতে বসতে বললেন,—“একবার চেয়ে দেখ দেখি চিনতে পাচ্ছ কিনা ? কাকে সঙ্গে এনেছি ?”

রেবতীবাবুর কথা শুনেই বিস্ফারিত নেত্রে ক্ষীরোদের দিকে চেয়ে, বিছানার ওপর ঠেলে উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগলেন সরোজবাবু। ছুঁপাশ থেকে লতিকা দেবী তাড়াতাড়ি ছুটো বড় তাকিয়া সরোজবাবুর ছুঁপাশে ঠেলে দিতেই তিনি সেই তাকিয়া হেলান দিয়ে, অনেকটা উঁচু হয়ে বসে ক্ষীরোদকে হাত ইসারায় পাশে ডাকলেন। পিতামাতার চরণ স্পর্শ করে, প্রণাম জানিয়ে, পূর্বেই ক্ষীরোদ গিয়ে তার বাপের মূণের কাছে এগিয়ে বসেছিল। ছেলের মাথায় এবং পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে সরোজ বায় বললেন—“আমি তখন বুঝতে পারিনি ক্ষীরো সেই জন্মই তোমাকে চেয়ার খুলে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমায় রীতিমত পরাস্ত করেছ! আজ আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। যা কিছু স্বাবর অস্বাবর সম্পত্তি রয়েছে, আজ থেকে সে সবই তোমার! তুমি আমার বংশের একমাত্র প্রদীপ! আমার সমস্ত দায়িত্বের বোঝা তুমি গ্রহণ করে আমাকে নিষ্কৃতি দাও ক্ষীরো! একদিন বাপ সঙ্গে তোমাদের মানুষ কারছি আজ এই স্বাবর দেহ নিয়ে বার্কিকোর তীরে এসে দাঁড়িয়েছি। আমার সমস্ত তিরস্কার, উপেক্ষা, ভুলে যাও; আমায় শান্তি দাও।

জীবন-সংগ্রাম

তুমি আমায় মার্জনা করো ক্ষীরো !” বলেই তিনি ভীষণভাবে হাঁপাতে লাগলেন। পিতার সেই অবস্থা দেখে, পকেট থেকে টেথিস্কেপ্‌টা বের করে ক্ষীরোদ ডাক্তার বেশ ভালো করে পিতার বুক পারীক্ষা করলো। তারপর বললো,—“আমাকে ভুল বুঝবেন না বাবা, আপনি কোনদিনই আমার প্রতি অবিচার করেন নি। অকারণ লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে, ভুল করেছিলাম আমি। সেজগৎ আপনি আমাকে মার্জনা করুন !”

—“মার্জনা ?—নিশ্চয় মার্জনা কোববো ! তুমি তো রাস্তার লোক নাও ক্ষীরোদ—তুমি যে আমার সন্তান”,—এই কথা বলতে বলতে সবোজ রায়েব চক্ষু জল এসে পড়লো। তখন, কম্পিত হস্তে তিনি বালিশের তলা থেকে একটা উইল বের করে, ক্ষীরোদের হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন—“এই নাও ক্ষীরো এটা আমি ইতিপূর্বেই ধীবেনবাবুকে দিয়ে সম্পন্ন করিয়ে রেখেছি। বালগঞ্জ, দেশ-প্রিয় পার্কের অনতিদূরে যে নতুন বাড়ীটা তোলা হয়েছে—এটে.; আর ধীবেনবাবুর ব্যাঙ্কের fixed deposit-এব টাকা কয়টা আমি শুধু মাধবীর ছেলেকে দিয়েছি।—আর...”

তারপর তিনি হাঁপাতে লাগলেন। পিতার অবস্থা দেখে ক্ষীরোদ ডাক্তার এক নিমেষে পকেট থেকে একটা ছোট্ট সিরিঞ্জ বের করে, তাতে একটা ইনজেকশন ভরে, সরোজবাবুর দক্ষিণ বাহুতে কৌশলে ফুটিয়ে দিতে দিতে বললো—“এত সব কিছুই করবার দরকার ছিল না বাবা। দিদিকে তো আমি কোন দিনই পর ভাবতে পারবো না। দিদির নামেই তো এ বাড়ীটাও লিখে

জীবন-সংগ্রাম

দিতে পারতেন ! মায়ের পর, এ সংসারে দিদি বই আমাকে দেখবার আর তো কেউ থাকবে না বাবা !”

—“সব ভারই তো তোমার উপর দিয়ে নিশ্চিত হয়েছি ! এখন যা কিছু করবার সবই তুমি !” তারপর অনেকটা আশ্বস্ত হ’য়ে বললেন—“কি ইনজেকশন আমাকে দিলে বলতো ? শরীরটা সতসা বেশ সুস্থ বোধ করছি যেন ? ভারি আরাম পাচ্ছি তো ! বুকটা যেন হালকা হয়ে আসছে । বেশ খিদেও পাচ্ছে যেন আমার !”

সে কথা শুনে, রেবতীবাবু মুখ তুলে লতিকা দেবীর দিকে চেয়ে বললেন,—“বৌদি সরোজকে কিছুটা হরলিকস্ খাইয়ে দিন ।” উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষীরোদ, তখন লতিকা দেবীকে উদ্দেশ্য করে বললো,—“মা তোমার মেনকাকে কিছুটা জল গরম চাপিয়ে দিতে বলা, আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি ।” তারপর সে কোথায় যেন গট-গট করে নেমে বেড়িয়ে গেল ।”

ক্ষীরোদ চলে গেলে রেবতীবাবু বললেন—“ছেলেকে এবার ফেরৎ পেলো তো ? যত সব তোমার পাগলামি দেখে-দেখে, গোটা সংসারটার ওপরেই আমার অভক্তি ধরে গেছে ।”

—“তুমি তো সে কথা বলবেই রেবতী— ; সংসারের ছোঁয়াচ যে তোমার গায়ে কোনদিনই লাগেনি ভাট ।” তারপর ধীরে ধীরে তিনি বলতে শুরু করলেন, “অনেক দিনের অনেক কথা আজ মনে পড়ছে রেবতী—! ছ’-এক বছরের ছোট বড় আমরা, কলেজ ছেড়ে দিয়ে স্বদেশী মুভ্‌মেন্টের কাজে লাগলে তুমি ।

জীবন-সংগ্রাম

সত্যগ্রহ করতে গিয়ে জেল খাটলে। সেখান থেকে বেরিয়ে মহাত্মা গান্ধী আর সি. আর. দাশের দলে যোগ দিয়ে, কংগ্রেসের কাজে মগ্ন হয়ে উঠলে। আমাকে দলে ভেড়াতেও তো চেষ্টার কসুর করে নি? কিন্তু ঐ পথটা কেমন যেন আমি ববদাস্তাই করতে পারিনি তখন। আমার স্বাবর অস্বাবর সম্পত্তি তখন আমার হাতে এসে গিয়েছে। মামিমার চেষ্টায় বিলেত থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে এদেশে ফিরলুম আমি। তারপর পেলুম লতিকাকে বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। স্বশুর মশাই মরবার সময় আমাকে ডেকে নিয়ে তাঁর সমস্ত বিষয় আশয় লিখে দিলেন লতিকার নামে। আমাকে বললেন,—‘লতিকা আমার বড্ড অভিমানী, ওকে তুমি কোনদিন আঘাত দিও না সরোজ।’ আনন্দের আশ্রয়ে তাবপর আমি চুটিয়ে শুরু করে দিলুম ব্যারিস্টারী ব্যবসা। এক বৎসরের ভেতরেই ব্যারিস্টারীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বসলুম। এই বাড়ী তখন উঠছে। ক্ষীরোদ তখন সেন্ট্‌জোভিয়ারে পড়ছে। মাধবীকে বেথুন থেকে ট্র্যান্স্‌ফার করলুম ডায়োসিশন কলেজে। আবার তুমি এলে আমার কাছে কংগ্রেসের পরোয়ানা নিয়ে। সাহায্য তোমায় আমি তখনো করেছি কংগ্রেসের নাম শুনে। কিন্তু তখনো ঠিক বুঝতে পারিনি, বিশ্বাস করতে চাইনি এই কংগ্রেসের বিশেষত্বকে। কিন্তু সেদিনকার তোমার সেই মিটিংয়ের বক্তৃতা শুনে আর ক্ষীরোদের হাসপাতালের চেহারা দেখে, সত্যিই আমি বিস্মিত এবং মুগ্ধ হয়েছি। সেইখানে বসেই আমি প্রথম উপলব্ধি করলুম,

জীবন-সংগ্রাম

কাজের ভেতর দিয়েই মানুষের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, টাকা
ভেতর দিয়ে নয় ; তাতেই লতিকাকে নির্দেশ দিয়েছিলুম হাস-
পাতালের ফণ্ডে ঐ টাকা কয়টা দিতে। জীবনের শেষ প্রাণে
এসে আজ বুঝছি—তুমি শুধু আমার বন্ধু নও রেবতী, তুমি
আমার সংসারেরও পরম হিতাকাঙ্ক্ষী। তোমার কংগ্রেসের
কাজের জন্য আমার ভবানীপুরের বাড়ীটা তোমাকে দেবার জন্য
ক্ষীরাকে উইলে নির্দেশ দিয়েছি, ওটা তুমি নিয়ে নিও। কিন্তু
তোমার অন্য সব ঋণ যে আমি জীবনে কি করে পরিশোধ
করবো তা আজও ভেবে উঠতে পারিনি।” তারপর তিনি
ভাবতে লাগলেন।

রেবতী বাবু আশ্চর্য আশ্চর্য বললেন,—“যা করেছ এই
আমার পক্ষে যথেষ্ট! কংগ্রেসকে কিছু কবা মানেনি তো
আমাকেই করা হোল—এবং এতেই তোমার সব ঋণ আমাকে
পরিশোধ করা হয়েছে। এখন তুমি সেরে উঠলেই আমি
নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করতে পারি।”

সরোজবাবু বললেন—“বিলাস বোধহয় মাধুকে আর
আসতে দিলে না?” উঠে দাঁড়িয়ে রেবতী বাবু উত্তর দিলেন,—
“তোমার কোন চিন্তা নেই,—এক্ষুণি ওরা এসে পড়লো বলে।
আমি এখন একটু উঠছি। পারি তো সন্ধ্যার পর আসবো।”
বলতে বলতে তিনি আশ্চর্য আশ্চর্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।
কিছুক্ষণ রেবতী বাবুর পথের দিকে চেয়ে থেকে স্ত্রীকে সরোজ
বাবু প্রশ্ন করলেন,—“এখন কটা বাজে লতু ?—”

জীবন-সংগ্রাম

“—এইতো সবে চারটে বাজলো ! তুমি অতো বাস্ত হ'চ্ছ কে'ন ? রেবতী বাবু যখন বলে গেলেন তখন ওরাও নিশ্চয়ই আসবে” । তারপর একটু ভেবে বললেন—“কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখেছ ? ক্ষীরোদের মনে তোমার সম্বন্ধে কোন 'দাগ পর্যন্ত পড়েনি । অভিমান ওর নেই ; ছেলেটা চিরকালই কেমন কাজ পাগলা আর নিরহঙ্কার জানতে তো ? অথচ কত ভুলই না ভেবে মরেছি ওর সম্বন্ধে আমরা এতদিন !”

লতিকা দেবীর কথার উত্তর দেবার কথাই হয়তো সরোজবাবু ভাবছিলেন । এমনি সময় তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে ডেকে উঠলো অরুণ—“দাছ আমি এসেছি ।” তার পেছনেই দাঁড়িয়ে মিনা বুড়োব দিকে উদগ্রীব দৃষ্টি মেলে চেয়েছিল । আর মাধবী গিয়ে মায়ের পেছনে তাঁর কাঁধের ওপরে মাথা রেখে, পিতাব রুগ্ন পাণ্ডুর মুখচ্ছবি দেখে আচল দিয়ে চোখের জল মুছতে লাগলো ।

অরুণের ডাক শুনে আনন্দের আতিশয্যে সরোজ চৌধুরী তখন, ত্রস্ত কম্পিত ছুটি বাহু তার দিকে মেল দিয়েই ডাকলেন—“এসো দাছ বুকে এসো” । বলেই তিনি জোর দিয়ে উঠে বসতে গিয়ে বিষম হাঁপিয়ে উঠলেন—। লতিকা দেবী তাড়াতাড়ি পেছন থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরতেই, মিনা অরুণকে তুলে খাটের উপরে উঠিয়ে তাব দাছর মুখের কাছে বসিয়ে দিল । সরোজ রায় হাত ইসারায় মিনাকে খোকায় পেছনে বসতে বললেন ।

জীবন-সংগ্রাম

অরুণের মাথাটা নিজের বুকুর কাছে টেনে নিতে নিতে সবোজবাবু বললেন—“তোমায় আমি আর কোথাও যেতে দেবো না দাছ!” তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, “কালকেই আসবো বলে তুমি সেই যে পালিয়ে গেলে, একবারটি আর তোমার মনে পড়লো না দাছ-দিদির কথা? আমি তোমার জন্ম কতো খেলনা,—আরো কতো কিছু আনিয়ে রেখেছি। কত লোক এলো গেল, আমি বল্লুম তাঁদের তোমার কথা। তাঁরা তোমার কবিতা শোনবার জন্ম বসে রইল কতক্ষণ! তা তুমি তো কৈ এলে না? তাহ তাঁরা সবাই চলে গেল! আমি তোমার জন্ম কত কেঁদেছি—তা তুমি জানো? এঁই দেখ আমার চোখের কোণে কাল পড়ে গেছে。” বলেই বুড়ো তাঁর চোখের কোন দু’টো টেনে নাড়িকে দেখালেন।

ছুঃখো এবং বালক-শুলভ লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে, কাঁদো কাঁদো মুখে, মায়ের দিকে একবার চেয়ে দেখে, অরুণ তার দাছুর গলাটা জড়িয়ে ধরে বললো, “আমি বাবাকে কত বলেছি তা তো তুমি জানো না? পিসিমাকে জিজ্ঞাস কবে দেখ, আমি কালও বলেছি ওঁকে, আমাকে এখানে নিয়ে আসতে। কিন্তু কেউ আমায় নিয়ে এলো না! আমি কি রকম কেঁদেছিলুম তুমি তো জানো না? তোমার বাড়ী যে কতদূরে, আমি কি করে ততদূরে একা একা পথ চিনে আসবো? তোমার মুখ দেখে আমার বড্ড কান্না পাচ্ছে! তুমি তেমনি করে একটু হাস-না দাছ?”

মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে নাড়ির দিকে চেয়ে, সরোজ রায়

জীবন-সংগ্রাম

বললেন—“তুমি আর আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না ব’ল ? কোনদিন আমাকে ছেড়ে থাকবে না ?” অরুণ মাথা দোলাতেই ভৃত্যের উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে তিনি বললেন—“ওরে কে আছিস ? খোকার সেই জিনিষগুলো সব নিয়ে আয় তো !” আরদালীর মত পোষাকে সুসজ্জিত একজন ভৃত্য তখন সরোজবাবুর খাটের নীচে থেকে, খোলা মেজের ওপরে টেনে বের করলো,—একটা ট্রাই সাইকেল ! একটা ফুটবল ; ব্যাটবল খেলবার সরঞ্জামের সঙ্গে ছু’খানি ব্যাট । ছু’খানি ছোট্ট টেনিস র‍্যাকেট সমেত—টান্জিয়ে খেলবার একটি রঙ্গীন জাল । একটা পিং-পং বাজনা । ছোট্ট একটি অভিধান । একটা চকচকে রূপায় বাধানো বাঁশী । ছু’খানা বড় বড় ছেলের পড়বার বিলিতি ছবির বই, আর—সেই সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে,—পরে খেলবার রকমারী পোষাক ও জুতো ।

পাশের ঘর থেকে লতিকা দেবী নিয়ে এলেন একটা মরক্কো লেদারের ছোট্ট সুন্দর সুটকেশ ! তার ভেতর থেকে বের করলেন সুন্দর একসেট বিলিতি ছবির বই । একসেট সুন্দর বাঁধানো খাতা । একডজন নানা জাতীয় পেনসিল । একটা চকচকে রূপার ঢাকনি দেওয়া কাঁচের দোয়াত । একখানা নয়নাভিরাম ব্লটীং প্রেসার । ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটা পেপার ওয়েট । ড্রইং অঁাকবার বিলিতি ধরণের নানাজাতীয় স্কেলের একটা বাক্স । ওয়ার্ড মেকিং তৈরীর এক বাক্স সেলুলয়েডের ইংরেজী অক্ষর । আর একটা বাক্স ভর্তি কতকগুলো হালকা কাঠের ওপরে আঁকা রকমারি, টুকরো টুকরো ঘরবাড়ী আর সিন সিনারীও তৈরী

জীবন-সংগ্রাম

করবার রঙিন কাঠের খেলনা। তার সঙ্গে রয়েছে,—রঙিন বাড়ী ঘর, নদী, পাহাড় ঝাঁকা একটা সুন্দর ছবির বই !

অরুণ এত সব জিনিষ জীবনেও এক সঙ্গে চোখে দেখেনি,—কোনটা দিয়ে যে কি খেলতে হয়, তাও তার ভালো করে জানা নেই। কিন্তু জিনিষগুলো তখন সে যদি পায় তবে যেন সে তক্ষুনি খেলতে শুরু করে দেয়, এমনি উদগ্রীব ললুপ দৃষ্টি মেলে অরুণ তখন একবার দাছর দিকে আর একবার জিনিষগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল।

টয়েজ-মেকিংএর বাস্কাটা খুলে, রঙিন কাঠের টুকরোগুলো দিয়ে, বিছানার ওপরে বই দেখে দেখে একটা বাড়ী তৈরী করতে করতে সরোজবাবু বলে ওঠেন—“এমনি করে সব তৈরী করতে হয়। বুদ্ধিমান ছেলেরা এ সব ভারি চটপট তৈরী করে ফেলতে পারে ! তৈরী কর দেখি ঐ রঙিন কাঠের টুকরোগুলো দিয়ে এই ছবিটার মতো একটা বাড়ী— ! তা হলেই এ সব তোমার !” বলেই বুড়া খোকার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন।

মুখ শুকিয়ে অরুণ তাড়াতাড়ি দাছর মুখের দিকে চেয়ে বলে ওঠে,—“আর আমি তৈরী করতে না পারলে তবে এ সব কাকে দিয়ে দেবে ?”

“তোমাকেই তো সব দিয়েছি ! সেদিন যে বলেছিলে তুমি খুব বুদ্ধিমান, রবিঠাকুরের কবিতা বলতে পারো, ইংরেজী বই পড়ো ? তার চেয়ে এ তো ঢের সোজা কাজ। ছবিব সঙ্গে

জীবন-সংগ্রাম

মিলিয়ে একটা আগে তৈরী করেই ফে'ল না ? না পারলে তখন আমি দেখিয়ে দেবো।”

বালক অরুণের আনন্দ তখন আর ধরে না। এত সব খেলনা, এত সুন্দর সুন্দর জিনিস, সবই তার দাছ তাকে দিয়ে দিয়েছে ? মন্দ ছেলেদের বুঝি কোন দাছই এত সব জিনিস দেয় না ? মনে মনে খুব ভালো ছেলে হবার একটা শিশু মূলভ প্রবৃত্তি নিয়ে ভাবী গস্তীর সম্ভাব ভাবে ট্রাইসাইকেল-টার দিকে দেখিয়ে অরুণ তার দাছকে বলে উঠলো,—“আম কত তাড়া-তাড়ি চালাতে পারি এটেতে চড়ে তোমায় তাই আগে একবার দেখিয়ে দেবো ?”

খুশীর উচ্ছ্বাসে বালিশ জড়িয়ে ধরে, উঠে বসতে বসতে সরোজ্র বায় বললেন,—“যাও দেখি, উঠে কেমন চালাতে পারো দেখি ? অরুণ তখন নিজের ভেতবে এক বিরাট কৃতিত্বের স্বর্গ রচনা করে ফেলেছে। দাছর কথায়,—একলাফে গিয়ে সে ট্রাই-সাইকেল-টাতে উঠে বসেই চালাতে শুরু করলো। বুড়োর আনন্দ তখন আব ধরে না। তার ঐটুকু নাতি এ'ত সব পারে ? পয়সা স্বার্থক হয়েছে খোকাকে জিনিসগুলো কিনে দিয়ে।

নিজের একমাত্র পুত্রের প্রাত পিতার এই অপ'রসীম বাৎসল্য দেখে মাধবীর ছুটি চক্ষু বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পরতে লাগলো। তার মনে অনুশোচনা এলো—অরুণকে তার বাবার কাছে ইতিপূর্বে পাঠায় নি বলে। সুন্দর রঙিন গালচা পাতা হল ঘরটার ভেতরে অরুণ যখন সাইকেল চালিয়ে ঘুর বেড়াচ্ছিল

জীবন-সংগ্রাম

তখন সরোজ রায় যেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভুলে গেছেন। তাঁর ঠাচ্ছে, তক্ষুনি উঠে গিয়ে তিনি যদি অরুণের সঙ্গে নীচের মাঠটায় খেলা করতে পারতেন, তা হলে হয়তো তাঁর নাতি আরো খুশী হতো!

লতিকা দেবী ছ'তিনবার স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন মিনা আব মাধবীর কথা, কিন্তু তাদের দিকে সরোজ রায় ফিরে চাইবাব পর্যন্ত অবকাশ পেলেন না। তারপর এক সময়ে অত্যধিক আনন্দের উত্তেজনায়, একেবারে তিনি বিছানা জুড়ে হাত পা ছড়িয়ে এলিয়ে পড়লেন। অরুণ তখন সাইকেলে চড়ে বাইরের বড় গাড়ীবারান্দাটার ওপাশে লুকিয়ে পড়েছে। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে,—মাধবী, লতিকা দেবী, আর মিনা,—সরোজ রায়ের মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়ে' দেখলেন,—প্রাণপণে নিশ্বাস টানছেন সরোজবাবু।

লতিকার ইশারায় ডাক্তার আর নাস' ছুটে এলো। মিনা তৎক্ষণাৎ নীচে ছুটে গেলো,—সরোজ-সেবা সদনে ক্ষীরোদ ডাক্তারকে আর বিলাসকে তার অফিসে টেলিফোন করবার জন্তু বাড়ীময় তখন হুলস্থূল ব্যাপার পড়ে গেছে।

দাছুর এই অবস্থা দেখে অরুণ পাছে ভয় পায় কিম্বা কেঁদে ওঠে, সেই আশঙ্কায় লতিকা দেবী একটা বেয়ারাকে দিয়ে খোকাকে বাড়ীর মাঠে নিয়ে গিয়ে খেলা করবার নির্দেশ দিলেন।

টেলিফোন করা শেষ হলে, মিনা তাড়াতাড়ি ওপড়ে উঠে সরোজ রায়ের বুক পরিক্ষা, এবং গায়ের উত্তাপ নেবার কাজে

জীবন-সংগ্রাম

ব্যস্ত হয়ে উঠলো। এমনি সময়ে হস্তদস্ত হয়ে ক্ষীরোদ ছুটে এসেই গরম জলের খোঁজ করে, পিতার বুক পরিষ্কার করতে শুরু করে, মা এবং বোনকে পাশের ঘরে চলে যেতে বললো। তাঁরা সরে যেতেই, ডাক্তার পাল, দু'জন ছাত্র ডাক্তারের সাহায্যে একটা গ্যাস দেবার যন্ত্র এনে ঘরের একপাশে রাখলেন। গরম জলের ভেতরে কি একটা ঔষধের মত বস্তু গুলে যেন ডাঃ পাল সরোজ বাবুর মুখে ছোট চামচের সাহায্যে পান করিয়ে দিয়ে, তক্ষুণি নীচে নেমে গেলেন।

মাথার পাশ থেকে মিনা, আর বুকের পাশ থেকে ক্ষীরোদ তখন, - সন্দিগ্ধ, উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি মেলে সরোজবাবুর দিকে চেয়েছিল। সহসা সরোজবাবু ছুঁচোখ মেলেই ডাকলেন— 'লতু'! তারপর ক্ষীরোদের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ডাক শুনে, মায়ের পেছনে পেছনে মাধবীও এসে সরোজবাবুর মুখের উপড়ে বুক পড়লো।

অতি কষ্টে, ক্লান্ত কম্পিত ছুঁচী বাহু দিয়ে সরোজ রায়, ক্ষীরোদ আর মিনার দু'খানি হাত সংগ্রহ করে, নিজের দিকে টেনে নিতে নিতে, লতিকার দিকে চেয়ে বললেন,—“তোমায় দি-য়ে গে-লা-ম!”..

একজন নাসের নির্দেশে মেনকা ইতিমধ্যেই কিছুটা গরম ছুধের সঙ্গে খানিকটা ভাইনাম্-গ্যালোসিয়া মিশিয়ে এনেছিল। তার হাত থেকে সেটা নিয়ে, বিশুদ্ধ মুখে ক্ষীরোদের দিকে চেয়ে, লতিকা বললেন—“এটা খাইয়ে দেবো?” সরোজবাবুর শুষ্ক

জীবন-সংগ্রাম

পাণ্ডুর ঠোঁট ছ'খানা তখন কেঁপে কেঁপে উঠছিল। সেইদিকে লক্ষ্য করে ক্ষীরোদ বোল্লো, --“দিতে পারো,—খুব অল্প করে”। কিন্তু চামচে করে তাই একটু সরোজ বাবুর মুখে ঢালতে গিয়ে লতিকা দেবীর হাতটা কেমন যেন কেঁপে উঠলো ; আর অমনি ঝপ্ করে অনেকটা দুধ তাঁর মুখে পড়ে গেল।

• হঠাৎ একটা বিকট ঘর ঘর শব্দ বেজে উঠলো সরোজবাবুর কণ্ঠ থেকে !

পিতার হাতের পাল্‌স্টা দেখেই ক্ষীরোদ একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বিছানায় বসে পড়লো। লতিকা দেবী তখন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

পিতার মৃত্যু মলিন মুখের দিকে সজল নয়নে চেয়ে, মাধবীর মনে যেন ঝড়ের দোলা বয়ে যেতে লাগলো। এক সময়ে তার মনে প্রশ্ন জাগলো,—চলতি জীবনের এই বিক্ষিপ্ত সংগ্রামে,— জয়ী হ'ল তার ভ্রাতা, না তার স্বামী বিলাস ? মাধবীর ঝাঁখি পল্লবে বড় বড় ছ'ফোঁটা জল তখন মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়বার জগ্জ টলমল করছিল।

*

*

*

সংবাদ পত্রের অফিস থেকে বিলাস যখন স্বশুরবাড়ী অভিমুখে যাত্রা করবার জগ্জ পথের তীরে এসে দাঁড়ালো তখন সমস্ত আকাশ খানা ঘনঘটাচ্ছন্ন রক্তিম মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। হাত ঘড়িটার দিকে নজর দিয়ে সে যেন চমকে উঠলো,

জীবন-সংগ্রাম

—সর্বনাশ ! সাতটা যে বাঞ্চে ? আর তার বিলম্ব করবার সময় নেই । টেলিফোনে সে মিনাকে কথা দিয়েছে, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার ভেতরেই সেখানে গিয়ে সে নিশ্চয় পৌঁছুবে !

পথে নেমে বিলাস দেখলো,—আশে পাশে কোথাও যান-বাহন কিম্বা পথচারীর চিহ্ন পর্যন্ত নেই । খানিকটা পথ যেতেই দম্কা ঝড়ের সঙ্গে হু-হু শব্দে বাদলের মাতামাতি শুরু হয়ে গেল । সেই দুর্ঘ্যোগের মধ্য দিয়েই —বিলাস তার গম্ভব্য স্থল অভিমুখে চলতে লাগলো,— ঠিক যেন, সংকল্পে অটল দিক্‌বিজয়ী বীর সৈনিকের মতো ।

—শেষ—

—ত্ৰীযতীশচন্দ্ৰ দাশগুপ্তেৰ অগ্ৰাণ্য বই—

কালৈৰ যাত্ৰা

বেদনা মধুৰ কয়েকটি মন্থস্পৰ্শী গল্পেৰ সংগ্ৰহ ।

(দাম--দেড় টকা)

প্ৰবাসী, আনন্দবাজাৰ, যুগান্তৰ, বসুমতী,
প্ৰভৃতি পত্ৰ ও পত্ৰিকাৰ দ্বাৰা উচ্চ প্ৰশংসিত ।

* * * * *

দশাননেৰ গল্প

দশটি ছাত্ৰ-দেহাৰু গল্প-সংগ্ৰহ ।

(দাম—দুই টকা)

‘প্ৰবাসী’ বলেন—“দশাননেৰ গল্পে উচ্চল আনন্দেৰ রস আছে,
মন্থস্পৰ্শী ৰোমাঞ্চ আছে, আৰু আছে অবকাশেৰ মুহূৰ্ত্তগুলি কাটাৰ
অক্ষুব্ধ মনেৰ ধোৱাক”—

‘যুগান্তৰ’ বলেন—“দশাননেৰ গল্প বলিবাৰ একটি নিজস্ব ভঙ্গি
আছে । ভাব ও ভাষাৰ সাবলীলতাৰ প্ৰত্যেকটি গল্পই প্ৰাণবন্ত হইয়া
উঠিয়াছে.....”

‘দেশ’ বলেন—“গল্পগুলিতে নানা দিক দিয়া বৈশিষ্ট্য আছে ।
যে সকল সমস্যা ও ঘটনা আমাদেৰ আশে পাশে অতি সহজ ভাবে
জমিয়া আছে, লেখক তাহা হইতেই বিষয়-বস্তু গ্ৰহণ কৰিয়াছেন এবং
অতি সহজ অনাড়ম্বৰ ভাবেই তাহা বিবৃত কৰিয়াছেন । বচনাৰ মধ্যে
প্ৰচ্ছন্ন বেদনা মিশ্ৰিত বিদ্ৰূপ, পাঠকেৰ মনকে নাড়া দেয়পাঠ শেষে
পাঠকেৰ মনকে মন্থ মধুৰ বসে প্লাবিত কৰে.....”

* * * * *

যে কোনও পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান কৰুন ।